প্রথম অধ্যায়

মূলকাব্যের গদ্য রূপান্তর

✤ বন্দনা অংশ ✤

ঈশ্বরকে স্মরণ করে বা তাঁর গুণকীর্তন করে কাব্য শুরু করাই ছিল মধ্যযুগীয় পাঁচালি কাব্যের রচনার রীতি। সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম মুসলমান কবি দৌলত কাজীও তার ব্যতিক্রম নন। তিনিও তাঁর বিখ্যাত 'লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না' কাব্যের শুরুতেই করেছেন ঈশ্বর তথা আল্লার বন্দনা গান।

কাব্যের শুরুতেই আদি অন্তহীন অদ্বিতীয় বিসমিল্লাকে সংসারের সার জেনে তিনি বলেছেন যে, তাঁর নাম স্মরণ করলে সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ হয় এবং সব কিছুতেই মঙ্গল হয়। সমস্ত কাজের সিদ্ধি লাভের মূল উৎস তিনিই, তাঁর নাম শুধুমাত্র স্মরণ করলে মৃত্যুও তাকে এড়িয়ে চলতে বাধ্য হয়।

যিনি সদাই করুণাময় এবং যাঁর নাম স্মরণ করলেই দারিদ্র্য মোচন হয়, তিনি রহমান। সুজন দুর্জন ইত্যাদি সকল প্রকার জীবকে অলক্ষ্যে থেকে তিনি আহার যোগান। "যাঁর কেহ নাই তুমি আছো তাঁর" এর মতোই অসীম দয়াময় রূপ তাঁর। তিনি অপার মহিমাসম্পন্ন তাই তিনি রহিম। পৃথিবী যখন পাপে পরিপূর্ণ হয়, তখনই "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" তিনি আবির্ভূত হন। প্রচন্ড আগুনে যেমন করে রাশি রাশি তুলো নিমেষে দগ্ধ হয়, ঠিক তেমনি তিনি লীলাময় রূপে সমস্ত পাপের মূলে কুঠারাঘাত করে তাকে বিনাশ করেন। যেখানে তাঁর নামই সমস্ত কার্যের মূল, তাই তাঁকে স্মরণ করার জন্যে আলাদা কোনও ক্রিয়াকান্ডের দরকার হয় না। যেহেতু তিনি সকল কাজের মূল উৎস, তাই নিজের কর্ম নিজে ঠিকমতো করতে পারলে তার মধ্যে দিয়েই তাঁকে লাভ করা যায়। তাই পৃথিবীর সকল জীব থেকে শুরু করে ঋষি মুনি পর্যন্ত সকলেরই একমাত্র সহায় হলেন তিনিই।

এই যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বা রহিম যাঁর নামের প্রভাবেই সমস্তরকমের বিপদ-আপদ দূরীভূত হয় তাঁর গুণের কথা ব্যাখ্যা করার মতো মূঢ় আর কেই বা আছে ? পিঁপড়ে যদি সাঁতার দিয়ে সাগর পেরোবার চেষ্টা করে, তাহলে তা যেমন হাস্যকর, কোনও ক্ষুদ্র বুদ্ধি লোকের পক্ষে সেই সর্বশক্তিমানের গুণকীর্তন করার চেষ্টা করাও ধৃষ্টতা মাত্র। তথাপি কবি নিজেকে ক্ষুদ্র শিল্পী বলে স্বীকার করেও সেই কল্পতরুসম রহিমকে একমাত্র সহায় জেনেই তাঁর নামগানে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

তিনি অরূপ, অনুপম নিরাকার। ত্রিভুবনে তাঁর সমতুল্য আর কোথাও কিছু নেই। মূল কথা হল—তাঁর নাম বিক্রির সওদা নয় যে ঘরে ঘরে তা বিলিয়ে কিছু ফায়দা তোলা যায়। মেছোনি যেমন করে মাচের চুবড়ি নিয়ে বাজারে যায়, আল্লার গুণকীর্তন সেরকমও নয়। তাঁর যে তত্ত্বকথা তা অনেকেরই বোধের অগম্য। অতএব সেই সমস্ত যুক্তিতর্ক, বিচার

বিতর্কের কচকচিতে না গিয়ে একমাত্র কথাতেই তাঁকে জেনে রাখা ভাল যে তাঁর মতো সত্য বিশ্বসংসারে আর কোথাও কিছু নেই। তাই তিনিই বেদমন্ত্র। কেউ যদি তাঁকে ছাড়া অন্য কিছুকে উচ্চ জ্ঞান করে তাহলে তাঁর মতো হীন আর কিছু নেই।

নৃপতিকে ঈশ্বরের প্রতিভু জেনেই তাঁর আজ্ঞা পালন করা সকলের উচিত। খোদার নবীর আজ্ঞা যে রাজা পালন করেন, সারা পৃথিবী তাঁর চরণবন্দনা করে। অতএব সমস্ত দ্বিরুক্তি ছেড়ে যদি সেই এক ও অদ্বিতীয়ে মনকে বেঁধে রাখা যায়, তাহলেই আর চিন্তার কিছু নেই। আল্লা ছাড়া আর কোনও ঈশ্বর নেই এবং মহম্মদ তাঁর দূত। আল্লার দীপ্তিতেই ত্রিভুবন আলোকিত। এক অনন্যসাধারণ জ্যোতিতে তাঁর সর্বাঙ্গ আলোকিত। সূর্যের মতো উজ্জ্বল সেই জ্যোতির ছটায় যেন পয়গম্বরের চিহ্নই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।

গ্রন্থারম্ভেই কবি আল্লা ও মহম্মদের বন্দনা ও প্রশস্তি গান করে সবশেষে আশরফ খানের গুণকীর্তন ও তাঁর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে পাঁচালি কাব্যের রীতি অনুযায়ী লেখা বন্দনা অংশটি শেষ করেছেন।

✤ রোসঙ্গ রাজস্তুতি ✤

এই অংশটিতে কবি মহম্মদ, পিতা-মাতা ইত্যাদি গুরুজন, বন্ধু-স্বজন সকলকে নমস্কার জানিয়ে এবং সকলের আশীর্বাদ ও প্রীতি প্রার্থনা করে তাঁর পাঁচালি রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। কর্ণফুলী নদীর পূর্বদিকে আরাকান বা রোসাঙ্গ রাজসভা। সেই রাজসভার অত্যন্ত প্রতাপশালী ও প্রভাবশালী প্রজানুরঞ্জক, ধার্মিক রাজা ছিলেন শ্রী সুধর্মা। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মগজাতি।

পাঁচালির পরবর্তী অংশ জুড়ে রয়েছে দোর্দন্ড প্রতাপ শ্রী সুধর্মার রাজ্যশাসনের খন্ড খন্ড চিত্র। তাঁর অমিতবিক্রমের কথা স্মরণে রেখে হিন্দু পুরাণের উল্লেখ সংবলিত নতুন দৃষ্টান্ত পরম্পরার সাহায্যে তিনি অঙ্কিত করেছেন বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাওয়ার মতোই বীরত্বসূচক কিছু খন্ডচিত্র। তিনি বলেছেন যে সীতার মতো সুন্দরীও যদি বনে বসে থাকে তথাপি তার দিকে দৃষ্টিপাত করার মতো দুঃসাহস কারো ছিল না। রাজ্যের প্রতিটি মানুষের মনে ছিল সুখ, দুঃখ কাকে বলে তা তারা জানত না। সুধর্মার যশের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল সারা পৃথিবীতে।

বাতাসে ভেসে ভেসে যেন সুধর্মার সুখের খবর পৌঁছে গেল সুরলোক নরলোক পার হয়ে পাতালে নাগলোকে। তক্ষক আবার সেখান থেকে সেই রাজকাহিনি বহন করে নিয়ে গেল দেবাদিদেব ইন্দ্রের সভায়। সব কিছু শুনে দেবরাজের ইচ্ছে হল সেই কীর্তিযশের অধিকারীকে স্বচক্ষে দেখার। শেষ পর্যন্ত ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা লোক লস্কর সমভিব্যাহারে ইন্দ্র সহস্রলোচনে সেই যশকীর্তি এবং তাঁর অধিকারীকে নিরীক্ষণ করলেন। তাহলে এমত রাজা যিনি, তাঁর নাম স্মরণ করলেই চিরসুখী হওয়া যায়, দারিদ্র্যও সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

পীর-গুরু, অতিথি-অভ্যাগত, সুজন-দুর্জন, আপন-পর নির্বিশেষে তিনি সকলকেই যথাস্থানে শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রদর্শন করেন। সকলেরই তিনি হিতৈষী। দান-ধ্যানে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। এই দুধর্মারই সুযোগ্য মন্ত্রী আশরফ খান, অভিজাত মুসলমান—যাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ স্বভাবতঃই শত্রুর বিনাশ সাধন করে। তিনি সদাসর্বদাই রাজা শ্রীসুধর্মার অনুগামী। একদিন রাজার ইচ্ছা হল অশ্ব গজ রথ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে তিনি মৃগয়ায় যাবেন। নেতৃত্বের দায়িত্ব পড়ল আশরফ খানের ওপর। আশরফ খানও অত্যন্ত সুনিপুণভাবে সে দায়িত্ব পালন করলেন।

আশরফ খানের নেতৃত্বে নানা ধরনের নৌকাকে বিচিত্র সাজে সজ্জিত করে রাজা শ্রী সুধর্মা চললেন মৃগয়ায়। কবি দৌলত কাজী অত্যন্ত সুনিপুণ ভাবে দক্ষতার সঙ্গে দিয়েছেন সেই যাত্রাপথের বর্ণনা। রাজার আমোদ-প্রমোদের বর্ণনা। প্রকৃত কাব্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে ভারতীয় ধ্বনিতত্ত্ববিদেরা যে বলেছেন—'কাব্যম্ গ্রাহ্যম্ অলঙ্কারাৎ', দৌলত কাজী রচিত কাব্যের এই অংশটি যেন তার উজ্জ্বলতম নিদর্শন। কাব্যের ছত্রে ছত্রে যেন ছড়িয়ে আছে ধ্বনিশাস্ত্রের সেই বেদবাক্যেরই প্রতিধ্বনি।

মধ্যযুগের সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান সাহিত্যের বা কবিদের আধুনিকত্ব ও অভিনবত্ব যে নরবাদ বা মানববাদের ওপরেই সু-প্রতিষ্ঠিত তার পরিচয় পাই আমরা কাব্যের পরবর্তী

অংশে। মানুষকে ঈশ্বরের সমতুল্য জ্ঞান করে, মানুষের কীর্তি বা কর্মকে চিরজীবী করে, মানবজীবনের চরম ও পরম প্রাপ্তিস্বরূপ সত্যকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে কবি যে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন, তা এককথায় দুর্লভ। এক পরের অংশে কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষক আশরফ খানের গুণকীর্তন করে, সাম্প্রদায়িকতা থেকে বহু দূরে সরে এসে ভারতীয় পুরাণাদির সত্যতা ও যথার্থতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, এবং তিনি যে সুধর্মার মন্ত্রী আশরফ খানের নির্দেশেই সহজ সরল বাংলা ভাষায় পাঁচালি ছন্দে এই কাব্যরচনাকর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাও তিনি এখানে জানিয়ে দিয়েছেন।

✤ ময়নাবতীর রূপ বর্ণনা ✤

এই কাব্যের নায়িকা ময়নাবতী রাজার কন্যা এবং অসাধারণ রূপবতী। নিসর্গ প্রকৃতির থেকে উপাদান সংগ্রহ করে কবি মনের মতো করে সাজিয়েছেন তাঁর কাব্যের নায়িকাকে। আকাশের পূর্ণচন্দ্রও যেন লজ্জা পায় নায়িকার স্বর্ণপদ্মের মতো মুখ দেখে। উপমা উৎপ্রেক্ষার আলংকারিক প্রয়োগের অসাধারণ দৃষ্টান্ত ঃ—

"মদনমঞ্জরী ভুরু কিবা শরাসল।
লুকি গেল পুষ্পধনু লজ্জার কারণ॥
পুষ্পশর জিনি নাসা শোভে বিদ্যমান।
লজ্জ এড়ি রহে অন্তর্গত কামবাণ॥

ঠিক এমনি করেই কবি দিয়েছেন সুন্দর উপমা চয়ন করে নায়িকা, শরীরের প্রতিটি ভাঁজের নিখুঁত বর্ণনা।

রূপবর্ণনা অন্তে কবি করেছেন নায়িকার গুণের প্রশস্তি। ময়নাবতী প্রিয়ংবদা, সুশীলা, পতিব্রতা ও সুমতি। নবযৌবনবতী ময়নাবতীর স্বামী হলেন লোর। লোরেরও দুর্জয় সাহস। পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষার জন্যে তিনি দৃঢ়সংকল্পিত। ময়নাবতী তাঁর প্রাণস্বরূপিণী মহিষী পার্বতী পরমেশ্বরের মতো তাঁরাও যেন দুই দেহ ও এক আত্মা।

পরবর্তী পঙক্তিগুলিতে কবি সুকৌশলে কাব্যটির পরিণতি পর্বের ইঙ্গিত দিয়েছেন এই বলে যে—

"যুবক নিষ্ঠুর জাতি পুরুষ দুরন্ত
এক পুষ্পে নহে জান মধুকর শান্ত॥"

ময়নাবতীর জীবনের ভবিষ্যৎ বিষাদময়তার সুর যেন এই দুটি পঙক্তিতেই নিদ্রাচ্ছন্ন।

এর পরেই দেখতে পাই পাত্র-মিত্র, লোক-লস্কর সমভিব্যাহারে লোরকরাজ চলেছেন মৃগয়ায়, তাঁর রাজ্যভার দেখাশোনার ভার দিয়ে।

✤ লোরের বনবিহার ✤

মৃগয়ারত রাজা লোর এবং তাঁর পত্নী ময়নার একাকীত্বের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন কবি এই অংশটিতে। কোনও নারী সঙ্গ ছাড়াই রাজা লোর বনে গেছেন মৃগয়া করতে। পরিবেশ ও প্রকৃতিতে মিলনের সম্পূর্ণ আয়োজন বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ নারীবিবর্জিত অবস্থায় শুধুমাত্র পাত্রমিত্র সমভিব্যাহারে অত্যন্ত নীরস ভাবেই হরিষে-বিষাদে যেন অতিক্রান্ত হয়ে গেল যৌবনের অনেকটা সময়।

অন্যদিকে লোরপত্নী ময়নার ও ওই একই দশা। মদনের হাতছানিতে পতিবিরহে সেও যেন জর্জরিতা। অভিমানবশত তাঁরও মনে হয়েছে—মৃগয়ায় গিয়ে রাজা লোর হয়তো বনের মধ্যেই সুচারু প্রসাদ রচনা করে নারীসঙ্গে রঙ্গক্রীড়া ও পাত্রমিত্র সহযোগে পাশা খেলায় মত্ত রয়েছেন। ময়না অন্তরে বাইরে ডুকরে উঠেছে, যখনই তার অকারণ অভিমান ও দুশ্চিন্তা এসে ঘা মেরেছে তার মনের দরজায়। ময়নার তখন মনে হয়েছে লোরের মতো স্বামী পেয়েও যেন সে হারাতে বসেছে। কেননা পুরুষ হল ভ্রমর জাতি, এক ফুলে যেন তার তৃষ্ণা মেটে না। শিশুকাল থেকে যে পতির সঙ্গে বসবাস, সেও যেন আজ হঠাৎ করে অন্যের হয়ে গেল, তাই অসহ্য বিরহজ্বালা বুকে নিয়েও এই নববসন্ত সমাগমে সে একা। সুরঙ্গনা দুচারদিন ধৈর্য করতে বলছে ময়নাকে। কিন্তু ময়নার অধৈর্য যেন আর কোনও ধৈর্যেরই বাঁধ মানে না, সে শুধু গুমরে মরে অকারণ হতাশায়।

✤ যোগীর আগমন ✤

এদিকে রাজা লোর এবং তাঁর পারিষদদের দিনকাটতে লাগল নিতান্ত নারীবিবর্জিত অবস্থায়, নির্জন অরণ্যেই। এমনি একদিন রাজা লোর তাঁর পাত্র-মিত্রদের নিয়ে সভা আলো করে বসে আছেন এবং নৃত্য-গীতে মনোনিবেশ করেছেন। এমন সময় দ্বারী এসে সংবাদ দিল যে প্রাসাদের বাইরে এক অদ্ভুত যোগী অপেক্ষা করেছেন। যোগী বসে আছেন জড়পদার্থের মতো। তিনি চলেনও না, টলেনও না। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে তিনি কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকেন। তিনি জটাধারী, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত, এক সন্ন্যাসী। তাঁর কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা। তাঁর তেজোদ্দীপ্ত অঙ্গ থেকে যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে তপস্যালব্ধ জ্যোতিপুঞ্জঃ।

যোগীর হাতে আছে একটি সোনার পটচিত্র। তাতে রয়েছে পুতুলসদৃশ সুন্দর একটি মেয়ের ছবি। যোগী কখনও সেদিকে দৃষ্টিপাত করছেন, কখনো দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছেন, হাসছেন, কাঁদছেন—সেই ছবিটিকে কখনো মস্তকে স্থাপন করছেন, কখনো হৃদয়ে। অর্থাৎ কি যেন এক অস্থিরতায় যোগী ছট্‌ফট্ করছেন।

দ্বারীর কাছে সমস্ত বিবরণ শুনে তক্ষুণি লোক পাঠিয়ে রাজা লোর যোগীকে আনালেন। যোগী প্রবেশ করলেন রাজা লোরের সভায়। রাজসভায় প্রবেশ করে যোগীর মনে হল—এ যেন দেবরাজ ইন্দ্রের সভা। পাত্রমিত্র পরিবেষ্টিত রাজা লোরকে দেখে যোগী অবাক হয়ে গেলেন, বিস্মৃত হলেন নিজেকে। তারপর সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই শশব্যস্ত হয়ে চেষ্টা চালাতে লাগল যোগীর চেতনার ফিরিয়ে আনবার। অবশেষে যোগীর জ্ঞান ফিরে এলে রাজা লোর পরম সযতনে যোগীকে তার সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করলেন।

রাজা লোরের কাছে যোগী সত্যমিথ্যায় মিশিয়ে সবকিছু বৃত্তান্ত দিলেন এবং লক্ষ্য করলেন সেই ছবির কথা শুনে রাজা লোরের মধ্যেও এক ভাবান্তর উপস্থিত হল। মুখের কথায় বর্ণিত সেই মেয়েটির ছবি যেন রাজা লোরের শারীরিক-মানসিক সমস্ত শক্তিকে হরণ করল। তখন সেই যোগী রাজাকে চিত্রে বর্ণিত কন্যার সত্যিকারের পরিচয় দিলেন। ছবিটি গোহারি রাজ মোহরার মেয়ে চন্দ্রাণীর। চন্দ্রাণী রাজকন্যা এবং রাজকুলবধূ। তাঁর স্বামী বামন বিখ্যাত বীর কিন্তু নপুংসক। গোহারী রাজকন্যা চন্দ্রাণীর রূপের কাহিনি দেশে দেশে প্রচারিত। সেই অপরূপ রূপের বর্ণনা শোনার পরে সকলেই একবার তাকে চোখে দেখে কান ও চোখের সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে চায়।

✤ চন্দ্রাণীর দাম্পত্য ✤

স্বামীর সংসর্গে থেকেও শারীরিক চাহিদার অপরিপূর্ণতা একজন বিবাহিতা নারীর জীবনকে কতখানি বিপর্যস্ত ও বিষাদাত্মক করে দিতে পারে তারই সুন্দর ও সজীব বর্ণনা আমরা পাই কাব্যের এই অংশে।

মোহরা নগরীর নাগরিক সমৃদ্ধিতে কোথাও কোনও ত্রুটির অবকাশ নেই। সমৃদ্ধ নগরী তাতে নানা জাতির বসবাস। রাজবধূ চন্দ্রাণীর রূপের আকর্ষণে, তাকে শুধুমাত্র চোখে দেখার মোহে সেখানে অনেক বীর, বলবান সুপুরষ রাজা-রাজড়ার আনাগোনা। দেবস্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বছরে দুবার রাজবধূ চন্দ্রাণী সখী পরিবৃতা হয়ে বাইরে আসেন। তাতে অনেক চাতকী দৃষ্টির তৃষ্ণার উপশম ঘটে।

অন্যদিকে রাজপুত্র বামন আকৃতিগত দিক থেকে বামন পদবাচ্য হলেও তার চরিত্রে বীরত্বের কোনও ঘাটতি নেই। অভাব যেটুকু আছে তা শৃঙ্গাররসের বা রতিরসের। তাই জ্বলন্ত কামের আগুনও তাকে ভস্মীভূত তো দূরের কথা বিন্দুমাত্র দগ্ধ করতেও পারে না। আর সেই কারণেই সে ফিরেও তাকায় না তার নিজের স্ত্রীর দিকেও। শিকার করা তার নেশা। তাই প্রতিদিন কিছু না কিছু বুনো জন্তু শিকার করে ফিরে এসেও সে আর প্রাসাদের অন্দরমহলে চন্দ্রাণীর কাছে যায় না, থাকে বাহিরমহলে।

দিনের পর দিন স্বামীর এ হেন আচরণ সহ্য হয় না চন্দ্রাণীর। জীবনের যে স্বর্ণমুহূর্তে 'যৌবনের বনে' মনের হারিয়ে যাওয়ার কথা, ঠিক সেই সময়ে এমন অনাহুত ব্রহ্মাচর্য পালন কারই বা ভাল লাগে? স্বামীর মন ভোলানোর জন্যে সে তাই প্রথমে পাঠায় তার সখীদের। সখীরা নানাধরনের শারীরিক পরিচর্যায়, বসনে-ভূষণে-সৌন্দর্যে, কাব্যিক পরিভাষায় চন্দ্রাণীর কামনাজর্জরিত বিরহব্যথার বর্ণনা দিয়ে বাসরের গুণবর্ণনা ইত্যাদি করে বামন রাজকুমারের মনে কামনার উদ্রেক ঘটাতে চায় তাদের প্রিয়সখীর বিরহ-ব্যথার উপশমে। সমস্ত কিছু শোনার পরে বামন মন স্থির করে ফেলে চন্দ্রাণীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার। সখীরা এসে সেই সুখবর জানায় চন্দ্রাণীকে এবং আরও বলে চন্দ্রাণীকে বামনের চিত্তহরণের উপযোগী সাজগোজ ও অঙ্গভঙ্গীমার জন্যে প্রস্তুত থাকতে, যাতে করে বামনের চিত্তে কামভাবের উদ্রেক ঘটে। হরষিত চন্দ্রাণী নিজেকে অনুরূপ উপযুক্ত ভাবেই সজ্জিত ও প্রস্তুত করল স্বামী সঙ্গ সুখের আশায়।

অবশেষে বামন এল। সুসজ্জিত শয্যায় স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে উপবেশন করল। নগরীতে আনন্দের বান ডেকে গেল। তাদের দুজনকে ঘিরে কিছুক্ষণে জন্যে চলল অনন্ত উল্লাস। সেই উল্লাসের সাক্ষী হয়ে রইল সমস্ত মোহরা নগরী, পাত্র-মিত্র, রাজা-রাণী, সামন্ত-পুরোহিত আর ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী। আর সেই রাগরাগিণীর অনন্ত সুরের অণুরণনকে অনন্ত কালের জন্যে ধ্বনিত করে রাখলেন দৌলত কাজী তাঁর অমর প্রেমগাথায়।

✤ নিশিযাপন ✤

এইভাবে সুখশয্যায় উপবেশনরত বামনের পাশে চন্দ্রাণী যেন বাঁদরের গলায় মালতী মালার মতোই শোভমান। পরিজনদের সঙ্গে নৃত্যগীতেই তাদের অর্ধেক রাত্রি কেটে গেল। বাকী রাতটুকুতে নিদ্রাদেবী সকলের চেতন হরণ করে নিলেন। সারা রাজপুরী যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন বামন ধীরে ধীরে খাট থেকে নেমে প্রদীপ নিভিয়ে মাটিতে বস্ত্র পেতে নিদ্রা গেল। বামনের এই ধরনের প্রতারণায় চন্দ্রাণীতো অত্যন্ত আশ্চর্য হল। কোথায় গেল তার চোখের ঘুম। অত্যন্ত ব্যথিত বিহ্বল চিত্তে চন্দ্রাণী একেবারে একাকিনী অবস্থায় সারা রাত জেগে রইল। সেই গভীর রাত্রে পাশে কোনও সঙ্গী নেই যে তাকে তার প্রাণের কথা খুলে বলে। আপনা আপনিই তাই চন্দ্রাণী বিলাপ করে আর মনে মনে নিজেকেই বলে যে কামক্রীড়ার কথা যদি বাদও দেওয়া যায় তথাপি স্ত্রীর সঙ্গে একটু মধুর কথাবার্তাও তো বামন বলতে পারত। সব কিছু ভুলে স্বামীর অমন পশুর মতো নিদ্রা যাওয়া চন্দ্রাণীর কাছে অসহ্য বোধ হয়েছে। একে তার পূর্বজন্মের কর্মফলজনিত অভিশাপ বলেই মনে হয়েছে। এইভাবে বারবার অনেক অসামঞ্জস্যপূর্ণ উপমায় নিজের ভাগ্যকে করাঘাত করতে করতেই চন্দ্রাণীর সেই অভিশপ্ত রাত ভোর হল।

ভোর হতেই সারা রাত জেগে থাকা চন্দ্রাণী আগে তার সখীদের ঘুম ভাঙাল। সেই সঙ্গে উঠে পড়ল বামনও। বামন উঠেই বীরের মতো ধনুঃশর নিয়ে বনের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। চন্দ্রাণীর সঙ্গে কোনো কথাবার্তাই সে বলল না। ক্রমে ক্রমে গত রাত্রির কথা কানাকানি হয়ে সবার কানেই পৌঁছল। ধাইকে সঙ্গে নিয়ে এলেন মহারাণী। অনেক সান্ত্বনা দিলেন তিনি চন্দ্রাণীকে এবং সেই সঙ্গে ধাইকে বামনের কাছে চন্দ্রাণীর মনোব্যথা বয়ে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতিও দিলেন। মায়ের কথায় আশ্বস্ত হয়ে চন্দ্রাণী তাঁকে সবকিছু খুলে বললেন এবং সবশেষে এও জানালেন যে বামনের মনের মধ্যে হয়তো চন্দ্রাণীর জন্যে কোথাও এতটুকু জায়গাও নেই। সব শুনে রাজমাতা কাতরা কন্যার বেদনা উপশমের জন্যে ধাইকে পাঠালেন বামনের কাছে।

ধাই অত্যন্ত দ্রুতপদে বামনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে বনে পৌঁছালে তাকে দেখে মাথা নত করে বামন শ্রদ্ধা জানাল। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ধাই অন্তরে দুঃখ নিয়েও সুকৌশলে বামনকে চন্দ্রাণীর সমস্ত সংবাদ দান করল এবং বামনকে ভৎর্সনা করে বলল যে, রাজবংশে জন্মগ্রহণ করে যথাযথ বীর হয়েও সে রাজকার্যের অনুপযুক্ত। কেননা যে নিজের পত্নীকে বিবাহিত জীবনে সন্তুষ্ট রাখতে পারে না সে উপযুক্ত প্রজাপালকরূপে পৃথিবী পালন করবে কেমন করে? আব প্রমাদবশত সকলের কাছে নিজের চারিত্রিক উদারতাকে ধরে রাখতে গিয়ে যে সে নিজের প্রাণসমা পত্নীর সমস্ত অবদমিত ইচ্ছাকে বারে বারে প্রত্যাখ্যান করছে—এটাই কি তার প্রকৃত রাজতুল্য কাজ হচ্ছে। রূপে সে বামন হলেও বুদ্ধিতে তো তার এমনটি হওয়া উচিত নয়। যার মনের সৌকুমার্য হারিয়ে যায়, শুধু বাহুবলে তার কি লাভ? শ্রীফল বা বেলের মতো সুন্দর সুমিষ্ট ফল যেমন কাক ভোগ করতে বা খেতে পারে না, ঠিক তেমনি বামনও তার দুর্ভাগ্যবশত নিজের ভুলেই চন্দ্রাণীর মতো সুন্দরী রমণীকে পত্নীরূপে পেয়েও পরিপূর্ণভাবে পেতে অপারগ। অথচ জগতে বহু দৃষ্টান্ত আছে যেখানে আমরা দেখতে

পাই পত্নী ছাড়া পুরুষের জীবন কখনোই সুন্দর ও পরিপূর্ণ নয়। কাজেই বামন কেন নির্বোধের মতো সকলের নিষেধ সত্ত্বেও পত্নীকে প্রত্যাখ্যান করতে এমন উদ্যোগী?

এই সমস্ত কথা বামনকে জানিয়ে ধাই তাকে চন্দ্রাণীর কাছে ফিরে যাবার আদেশ করল রাজমাতার আদেশ অনুসারে। কারণ জগতে পশু থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত কেউই পত্নীকে ত্যাগ করে স্বাভাবিক ভাবে বাঁচতে পারে না।

ধাইয়ের কাছে এত উপদেশ ও ভর্ৎসনা শুনে বামনের মনে মনে রাগ ও লজ্জা দুইই হল। শেষপর্যন্ত ধাইকে সে চন্দ্রাণীর কাছে যাবার ইচ্ছা জানাল এবং চন্দ্রাণী যেন তাকে ক্ষমা করে দেয়—একথা বলতেও কুণ্ঠা বোধ করল না।

ধাই সমস্ত সমাচার নিয়ে ফিরে গেল রাজমহিষীর কাছে। তার কাছে জামাইয়ের সমস্ত বার্তা অবগত হয়ে মহিষী জানাল রাজাকে। রাজা একথা শুনে সৈন্যসামন্তদের আদেশ করলেন কিছুদূর অগ্রসর হয়ে জামাইকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বরণ করে আনতে।

❖ পুনরাগমন ❖

এদিকে বামন তো সেই নিকুঞ্জ বন ত্যাগ করে রাজবাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হল। অবশেষে সন্ধ্যাবেলায় সে বীরের মতো অন্তঃপুরে প্রবেশ করে পত্নীর কাছে গেল।

স্বামীকে দেখে চন্দ্রাণী হাসিমুখে তার খবরাখবর নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, অকস্মাৎ এমন চোরের মতো বেমানান ভাবে যুবরাজ অর্থাৎ তার স্বামী সকলের অগোচরে অন্দরমহলে প্রবেশ করলেন কেন? তাঁর সেই রাজকীয়তা, সৈন্য সামন্ত, চামর-ধ্বজা ইত্যাদি কোথায়?

এই প্রশ্ন করে চন্দ্রাণী তার স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে উত্তর পাবার আশায়। কিন্তু উত্তর আসে না। তখন চন্দ্রাণী স্বামীর শরীরে ও মনে নিজের প্রভাব বিস্তার করার জন্যে নানারকম কামকলার আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। কবি মন্তব্য করেছেন—"বৃষ সঙ্গে রোহিণী বিলাস॥"

যাইহোক চন্দ্রাণী তো স্বামীর এই নির্লিপ্ত অবস্থা দেখে বুঝতে পারল যে তার আশা, মনের ইচ্ছা সবই অপূর্ণই রয়ে গেল। এমন পতিলাভকে সে ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাস বলেই মেনে নিল।

এই সমস্ত মনের কথা মনেই চেপে রেখে চন্দ্রাণী সহ্যের সীমা অতিক্রম করে স্বামীর হাতে হাত রাখল অত্যন্ত আক্রোশবশত। মূঢ় পতির তাতে কিছুই মনে হল না, সে চন্দ্রাণীর এই সমস্ত শিশুসুলভ আচরণকে খুব সহজেই ক্ষমা করে দিল। সমস্ত কিছুর থেকে চন্দ্রাণী বুঝতে পারল যে—যে কোনও কাজই করতে হয় ভেবে চিন্তে। তাহলে তার পেছনে কোনও কলঙ্ক যন্ত্রণা থাকে না, সবকিছু বুঝতে পেরেও চন্দ্রাণী সারারাত জেগে থাকল পতিদেবের আসার আশায়। চন্দ্রাণীকে শয়ন করতে দেখে রাত্রিশেষে পুনরায় ধনুঃশর নিয়ে বামন খুশি মনে বনে চলে গেল।

✤ চন্দ্রাণীর খেদ ✤

নিশিশেষে ভোরবেলায় নির্বিকারচিত্তে বামন ধনুঃশর নিয়ে বনগমন করলে অত্যন্ত সন্তপ্তচিত্তে চন্দ্রাণী তার মায়ের কাছে এসে সবকিছু খুলে বলল। অসহনীয় মদনজ্বালায় তাপিত চন্দ্রাণীর লজ্জা, ভয় বলে আর কিছুই রইল না। অকপটেই সে মাকে জানাল যে স্বামীহীন নারীর আর সংসার থেকেই বা কি লাভ? অন্তরে যখন কামনার আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে, তখন সুশীতল দখিণা বাতাসের মতো স্বামীর গুণ স্মরণ করে নিশিযাপন করা—কোন রমণীর পক্ষেই বা যন্ত্রণার সন্তাপের কারণ নয়? স্বামীই তো নারীর মঙ্গল, মনের আনন্দ, কামনার শান্তি আর বিরহের পরিত্রাতা।

রসিক পুরুষের প্রেমেই নারী বশ হয়। এ হল জাগতিক নিয়ম। এ হল সৃষ্টির রহস্য। তাই বামনকে লোকে যতই সিংহের মতো পরাক্রমশালী বলুক না কেন বামন আসলে তা নয়। শুকের সঙ্গে যেমন বকের ক্রীড়া শোভা পায় না বা হাস্যকর ঠিক তেমনি চন্দ্রাণীর সঙ্গে বামনেরও। চন্দ্রাণীর তাকে পশুতল্য বলে মনে হয়েছে। নিদারুণ ক্ষোভে চন্দ্রাণী বলেছে—

"না মাগম কেলিকলা রতিরঙ্গরস।
পশু সঙ্গে মনুষ্যের কোন অভিলাষ॥
মূঢ় স্বামী সঙ্গে ক্রিয়া সহস্র জঞ্জাল।
একাকিনী সময় গোঁয়াই সেই ভাল॥"

এরপর চন্দ্রাণী আবেদন জানিয়েছে তার মায়ের কাছে। তাকে একখানা সুন্দর বাড়ী তৈরি করে দেবার জন্য। সেখানে সে তার সখীদের নিয়েই দিন যাপন করবে। এছাড়া মাকে এই বলে সতর্ক করে দিল যে, ফের যদি কোনদিন তাকে বামনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আয়োজন করা হয়, তাহলে সে বিষ খেয়ে প্রাণত্যাগ করবে।

চন্দ্রাণীর মুখে এই কথা শুনে রাজমহিষী তখনই সেকথা নৃপতিকে জানালেন। অবশেষে, চন্দ্রাণীর জন্যে তৈরি হল সুরম্য প্রাসাদ এবং সেখানেই হল চন্দ্রাণীর অধিষ্ঠান। বছরে দুবার সে বাইরে বেরিয়ে আসবে দেবস্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে।

এদিকে সুন্দরী চন্দ্রাণীর রূপ দর্শন করার জন্যে সবাই তো পাগল প্রায়। তাই তার ওই দেবদর্শনে যাওয়ার সময়টুকুই যেন রাজা, যুবরাজ, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সবারই আকাঙ্ক্ষিত। একদিন রাজ্যমধ্যে কোনও এক উৎসব উপলক্ষে চন্দ্রাণী দেবস্থানে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করল এবং সখী সমভিব্যাহারে সেখানে উপস্থিত হল।

✤ চন্দ্রাণী দর্শনান্তে যোগীর মূর্চ্ছা ✤

রাজ্যমধ্যে উৎসব উপলক্ষে দেবস্থানে আগত চন্দ্রাণীর রূপ দেখে এক যোগী মূর্ছিত হলেন। পরবর্তী স্তবকে যোগীর সমাধিতত্ত্বের যে বিবরণ দেওয়া আছে, তা মূলত সূফী সম্প্রদায়ের যোগসমাধি তত্ত্বকথা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, সূফী ধর্মমতের মূল কথাটি। সূফীরা মনে করে জীব ও জগত সৃষ্টি করে ঈশ্বর বা আল্লা নিজেকেই প্রকাশ করেছেন। স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্ট জীবের সম্পর্ক অদ্বৈত। তাঁরা মনে করেন, যদিও ঈশ্বর সর্বজীবে বিশ্বময় কিন্তু পরম সত্তায় তিনি অবাঙ্‌মনসগোচর। আর মানবত্মা দেহের আধারে ইন্দ্রিয়গোচর। এই বিশ্বাসে সূফীরা শরীয়তপন্থী, কিন্তু ঈশ্বরকে পাবার পন্থা ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে সূফীধর্মের সঙ্গে শরীয়ত পন্থার মিল। সেই সূফীরা উপাসনা করেন না, আরাধনা করেন এবং সেই আরাধনার বাণী প্রেমময়। তাঁদের মতে প্রেমিক প্রেমিকার যে সম্পর্ক, সৃষ্ট জীব ও স্রষ্টা ঈশ্বর বা আল্লার সম্পর্কও সেইরকম। সূফী মতানুযায়ী প্রেমময় সৌন্দর্যময় আল্লাকে প্রেমের তপস্যা ও সৌন্দর্য ধ্যানের মধ্যে দিয়ে পেতে হয়। এই ধর্মমতে পার্থিব প্রেম ঐশী প্রেমের সোপান। নরনারীর পরস্পর রূপাসক্তি ও প্রেমবোধই প্রকারান্তরে পারমার্থিক প্রেমসৌন্দর্যের আস্বাদন। এইভাবেই সাধকের আত্মলীনতা ঘটে। এই মরমীপন্থী সূফী সাধকরা পরবর্তীকালে তান্ত্রিক মতের ও কায়াসাধনার দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন। বিশুদ্ধ সূফী প্রেমধর্ম ছিল নিকায়পন্থী, মানসাশ্রিত ও ধ্যানময়।

চন্দ্রাণীর রূপ দর্শন করে যোগী পার্থিবভাবে তিন দিন রাত্রি সংজ্ঞাহীন হয়ে রইলেন। ধর্মগত দিক থেকে দেখতে গেলে বলতে হয় যোগসমাধিতে মগ্ন রইলেন। এইভাবে তিনদিন থাকার পরে দেবস্থানের সমবেত জনমন্ডলীর প্রচেষ্টায় যোগীর চেতনা ফিরে এল। চেতনা ফিরে আসার পর নানা লোকের তির্যক বাক্যবাণ যোগীর ওপর বর্ষিত হল। যোগীর বেশ ধারণ করেও নারীর রূপের প্রতি এত তীব্র আসক্তি যে নিতান্তই গর্হিত অপরাধ একথাই যেন সবাই যোগীকে বোঝাতে চাইল।

কিন্তু ভিন্ন জনের কাছ থেকে পাওয়া এত অপমান যোগীর সহ্য হল না। তিনি তখন সেই দেবমন্দিরে দেবীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। ক্ষণিকের মধ্যেই যোগীর মন প্রাণ জুড়ে রইল শুধু দেবীমূর্তি। তিনি তাঁর যোগ-সাধনা, জপ-তপ, মন্ত্র-তন্ত্র সবকিছুই দেবীর চরণে অর্পণ করলেন।

যোগীর আত্মলীনতায় বা একাগ্রচিত্ততায় সন্তুষ্ট হয়ে অবশেষে দেবী তাঁকে দর্শন দান করলেন। কিন্তু এ সব যোগীর চিত্তবিকার মাত্র। সমবেত জনতার উপহাসে যোগীর বিকারের ঘোর কাটল। তিনি বুঝতে পারলেন যে চন্দ্রাণীর রূপের ছটাকেই তিনি দেবীর পরম কৃপালাভ বলে ভুল করেছিলেন। পরে যখন সেই ভুল ভাঙল তখন চন্দ্রাণীর রূপের কাছেই যোগীর সংযমী চিত্ত পরাজয় স্বীকার করে জন্মজন্মান্তর সেই রূপ দর্শনের পিয়াসী হয়ে রইল।

অতঃপর সেখান ছেড়ে যোগী যখন বাউলের বেশে ভ্রমণ করতে করতে বনে এলেন, তখন তিনি সেখানে দেখলেন, রাজা লোরকে। লোরকে দেখেই যোগীর পুনরায় মনে হল চন্দ্রাণীর কথা। তিনি কল্পনায় দর্শন করলেন, বিদ্যা ও সুন্দরের মতোই লোর ও চন্দ্রাণীর অবৈধ যুগল মিলনের চিত্র, এবং একথা মনে উদয় হওয়া মাত্রই তিনি রাজার কাছে উপনীত হয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করলেন চন্দ্রাণীর রূপের বৃত্তান্ত। বর্ণনা শুনে রাজাও চিত্তবিভ্রমের শিকার হলেন এবং শেষ পর্যন্ত যোগীর সঙ্গে চন্দ্রাণী দর্শন অভিলাষে সৈন্য-সামন্ত সজ্জিত করে বেরিয়ে পড়লেন।

✤ চন্দ্রাণী কর্তৃক লোর দর্শন ✤

অবশেষে লোরক নৃপতি চন্দ্রাণী দর্শনের জন্যে গোহারি দেশে এলেন। তাঁর সর্বক্ষণের ভাবনা কীভাবে তিনি চন্দ্রাণীর দর্শন পাবেন। কেননা চন্দ্রাণীর দর্শন সহজে মেলা সম্ভব নয়। তিনি থাকেন অত্যন্ত নির্জন স্থানে, প্রাসাদের উঁচু প্রাচীরের ঘেরাটোপের মধ্যে। এইভাবে ভাবতে ভাবতেই এক দুই তিন করে ছ মাস কেটে গেল তথাপি রাজা চন্দ্রাণীর দর্শন পেলেন না। এইভাবে একবছর কেটে গেল। বছরে দুবার চন্দ্রাণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, অতএব রাজার মন আরও চঞ্চল হয়ে উঠল। আশেপাশের অনেক রাজাই এসেছে চন্দ্রাণী দর্শন অভিলাষে। রাজা লোরও রুচি অনুযায়ী সাজগোজ করে এলেন সেই দর্শনসভায়। প্রাসাদের জানালা থেকে চন্দ্রাণী এই সমস্ত কিছুই লক্ষ্য করল।

বিধির বিধান খন্ডন করতে কেউ পারে না। আর সেইজন্যই জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকা চন্দ্রাণীর চোখে পড়ল লোরের রূপ। সেই রূপ দেখে বিস্মিত চন্দ্রাণীর চোখের সামনে থেকে বিশ্ব ভুবন লুপ্ত হল। চন্দ্রাণী অচেতন হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সখী থেকে শুরু করে মহারাজ পর্যন্ত প্রাসাদের সকলেই চন্দ্রাণীকে নিয়ে শশব্যস্ত হয়ে পড়ল। হতাশ লোরের চন্দ্রাণী দর্শন পুনরায় বাধা প্রাপ্ত হল। মুহূর্তের জন্যে লোরের মনে হল যে সে নিজের ধনকে হেলায় ত্যাগ করেছে বলেই হয়তো পরধন লাভ তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। অর্থাৎ ময়নামতীকে ভুলে চন্দ্রাণীর দিকে হাত বাড়িয়েছে বলেই হয়তো তার এই শাস্তি। অতএব মনের মধ্যে অহরহ চন্দ্রাণীর রূপ কল্পনা করেই লোরের দিন কাটতে লাগল।

এদিকে আবার চন্দ্রাণীরও তথৈবচ অবস্থা। লোরকে দর্শন করে অবধি চন্দ্রাণীও যেন—

'বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে
যেমন যোগিনী পারা।"

চঞ্চল হৃদয় যেন লোরের বিরহে দিন দিন ক্ষীণতর হয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু চন্দ্রাণীর এহেন অবস্থা কেন হল, তা কেউই বুঝতে পারে না। শেষে ধাই অত্যন্ত আকুল হয়ে চন্দ্রাণীকে এমতাবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করল। ধাইয়ের অভয়বাণীতে সাহস সঞ্চয় করে চন্দ্রাণী ধাইকে তার অন্তরের সমস্ত বেদনার কথা খুলে বলল এবং লোরক রাজাকে পুনরায় দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করল।

শেষপর্যন্ত ধাইয়ের পরামর্শে সমস্ত নৃপতিকেই পুনরায় সভা করে আমন্ত্রণ জানানো হল। সমস্ত রাজা-রাজড়ার সঙ্গে নৃপতি লোরও উপস্থিত হলেন সেই সভায়। চন্দ্রাণী পুনরায় সেই জানালা দিয়ে দেখল তার ইপ্সিত রূপসম্রাটকে। শুধু নিজে নয় সেই রূপ দর্শন করাল তার ধাইকেও।

লোরের রূপ দর্শন করে ধাইয়ের মনে স্বস্তি এল। মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু ধাইয়ের মনে হল চন্দ্রাণী কীভাবে দর্শন দেবে রাজা লোরকে, কেননা নৃপতিরা সকলে মন্ডলাকারে উপবিষ্ট এবং সভাকক্ষে প্রবেশের দ্বারটি রয়েছে লোরের ঠিক পেছনদিকে। যাইহোক চন্দ্রাণী সখীদের হাতে সকলের জন্যে গন্ধপুষ্প পাঠিয়ে দিল। উপযুক্ত সময় বুঝে ধাইও তার উপযুক্ত বুদ্ধি প্রয়োগ করল।

❖ মুকুরে চন্দ্রাণীর প্রতিবিম্ব দর্শনে লোরের মূর্চ্ছা ❖

এরপর ধাই বুদ্ধি শিখা তার সময়োপযোগী বুদ্ধি প্রয়োগ করল। সে নবরত্নে তৈরি একটি সুন্দর আয়না সেই নৃপতিসভায় পাঠিয়ে দিল। সেই অপূর্ব আয়নার শোভায় মুগ্ধ হয়ে নৃপতিদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল কে আগে সেই সুন্দর দর্পণে নিজের সুন্দর রূপ দেখবে এই নিয়ে। অবশেষে আয়না সব হাত ঘুরতে ঘুরতে শেষে নৃপতি লোরের হাতে এল। বুদ্ধি শিখা গোপনে জানালা দিয়ে তা দেখল।

লোরের হাতে আয়না দেখে ধাই এসে সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রাণীকে খবর দিল এবং বলল যে, চন্দ্রাণী যেন এই মুহূর্তেই দ্বারে গিয়ে আয়নায় নিজের রূপ প্রতিফলিত করে লোরকে আবিষ্ট করে ফেলেন। তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত তাড়াতাড়ি চন্দ্রাণী ধাইয়ের সেই আজ্ঞা পালন করল। চন্দ্রাণীর প্রতিফলিত রূপ দর্পণে দর্শন করে হতচকিত লোর সভামধ্যেই অজ্ঞান হয়ে পড়ল। সভামধ্যে হায় হায় রব উঠল লোরের আকস্মিক এই মূর্ছা যাওয়ায়[১]।

লোরের মূর্ছিত হয়ে পড়ার সংবাদ চন্দ্রাণীর কানে যেতেই তারও শারীরিক ও মানসিক উষ্ণতা যেন আরও বেড়ে গেল—তার প্রতি লোরের নিবিড় আকর্ষণের ভাব উপলব্ধি করে। অতঃপর অনেক যত্নে লোরকে শিবিরে নিয়ে যাওয়া হল। চেতনা পাবার পরে একটু স্বাভাবিক হয়ে লোরের মনে পড়ল সব কথা।

মদনের বাণের আঘাতে তাঁর শরীর ও মন তখনও জর্জরিত। তাঁর মনের মধ্যে অনুশোচনা হেতু স্বগতোক্তি করে তিনি বললেন যে, সুমধুর প্রথম দর্শন, যা মধুর থেকে মধুরতর ভাবে দীর্ঘস্থায়ী হওয়া উচিত তা যেন তাঁর হল না। চন্দ্রাণীর সেই মোহিনী রূপ দেখার সৌভাগ্য হয়েও যেন তা নয়নভরে দেখা হল না।

এদিকে অন্তঃপুরে চন্দ্রাণী ধাইয়ের কাছে ঘন ঘন নিচ্ছে লোরের খবরাখবর। মদন জ্বরে জর্জরিত সেও। ধাইয়ের মুখে সে জানতে পারে নৃপতি লোরেরও ওই একই অবস্থা, বরং লোরের বিরহ যেন আরও তীক্ষ্ণ, আরও তপ্ত। ধাইয়ের উপদেশ—চন্দ্রাণী যেন নিজেকে একটু সামলে রাখে। নইলে তার কাতরতা জনমানসে উপহাসের উপকরণ হয়ে পড়বে, তখন চন্দ্রাণী কি করে সভামধ্যে সকলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়াও বুদ্ধি শিখার সনির্বন্ধ অনুরোধ—চন্দ্রাণী যে কাজ করতে চলেছে, তা যেন আর একবার ভেবে দেখে। ধাইয়ের কথায় ক্রুদ্ধ চন্দ্রাণী তখন বলে যে, প্রেমের আগুনে দগ্ধ হলে জাতি-কুল-লাজলজ্জা-ধর্ম সব কিছুই পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। তারও তাই-ই হয়েছে এখানে আর পুনরায় ভাববার মতো কিছুই নেই।

নিরুপায় ধাই তখন চন্দ্রাণীর সুখের কথা চিন্তা করে লোরের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে লোরের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হল। দ্বারীর মাধ্যমে লোরের কাছে সংবাদ গেল যে এক বৃদ্ধা

১। দর্পণে চন্দ্রাণীর রূপ দেখে লোরের মূর্ছা ইত্যাদি বৃত্তান্ত মুল্লা দাউদের চন্দায়ন কাব্যে নেই, দৌলতের এই বিবরণ জায়সীর পদুমাবৎ কাব্যে বর্ণিত মুকুরে বিম্বিত পদ্মাবতীর রূপদর্শনে আলাউদ্দীনের মূর্চ্ছা ঘটনার অনুরূপ।

কোথা থেকে এসেছে নৃপতির সঙ্গে দর্শনের অভিলাষে। তারপর লোরের নির্দেশে ধাই এল নৃপতির সামনে। ধীরে ধীরে তার খবরাখবর নিয়ে ধাই জিজ্ঞাসা করল যে রাজপুরীতে লোরের আগমন কীসের জন্যে, তাঁর বংশ পরিচয়ই বা কি? ছলনা করে আত্মপরিচয় দিয়ে সে জানাল যে তার নাম ব্রতশীলা। বৈদ্যকূলে তার জন্ম। অসুস্থতার খবর পেয়েই লোরের কাছে তার আগমন নৃপতির আরোগ্য কামনায়। বৃদ্ধার কথা শুনে লোর হেসে বললেন যে তাঁর মর্মব্যথা আরোগ্য করার মতো ওষুধ বৃদ্ধার ঝুলিতে হয়তো নেই।

এই উপহাসবাক্য শুনে ধাই জানাল যে সে তাঁর ভালো করার মতো মহৎ মন নিয়েই সেখানে এসেছিল, ওষুধ বেচে পয়সা উপার্জনের লোভে নয়। কারণ চন্দ্রাণীর দয়ায় তার কোনও কিছুরই অভাব নেই, তাই কারো প্রদত্ত ধনের তোয়াক্কা ও সে করে না। এই বলে ধাই চলে যাবার উপক্রম করল।

চন্দ্রাণীর নাম শুনে নৃপতির হৃদয়ে কামনার জ্বালা আরও তীব্র আকার ধারণ করল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হয়ে ব্রতশীলাকে অনুরোধ করলেন যে ওই চন্দ্রাণীর নামই তাঁকে অহর্নিশি মর্মপীড়া দিয়ে চলেছে। তাঁর শরীর মন প্রাণ সবকিছুই উন্মুখ হয়ে আছে শুধু তারই জন্য।

নৃপতির এহেন কাতরতা দেখে ধাইতো প্রমাদ গুণল। নৃপতির কথায় তেমনভাবে কর্ণপাত না করে সে তখন চন্দ্রাণীর কাছে গিয়ে সমস্ত সংবাদ জানাল।

✤ দেবীমন্দিরে লোরচন্দ্রাণী সাক্ষাৎ ✤

বৃদ্ধি শিখাকে দেখে চন্দ্রাণীর মন অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আনন্দের সঙ্গে রাজকুমারী তাকে লোরের সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করল। উত্তরে ধাই জানাল যে সে তাদের দর্শন ও মিলনের সমস্ত উপায় মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে।—আসন্ন উৎসবের দিনে নৃপতি লোর যোগীবেশে দেবীমন্দিরে দেবীর সামনে ধানস্থ থাকবেন আর চন্দ্রাণীও যাবে উৎসবের দিনে মন্দিরে পুজো দিতে। অতএব সেই হবে সাক্ষাত মিলনের উপযুক্ত স্থান এবং সময়।

এই বলে ধাই গেল সেকথা নৃপতি লোরকে গোপনে জানিয়ে আসতে। লোরের ঘরে প্রবেশ করেই সে তার রাজবৈদ্য পরিচয় অম্লান রেখে লোরকে তাঁর অসুস্থতা আরোগ্যের উপযুক্ত ওষধু দিতে চাইল। লোর তখন ধাইকে তাঁর মর্মব্যথার প্রসঙ্গ তুলতেই ধাই হেসে জবাব দিল—মর্মব্যথা প্রশমনের একমাত্র ওষুধ 'প্রিয়া-দরশন'-এর কথা। সেই সঙ্গে আরও জানাল যে, এই অবৈধ প্রেমের কথা যদি চন্দ্রাণীর স্বামী বামন জানতে পারে তাহলে সমস্ত কিছু লন্ডভন্ড তো করবেই উপরন্তু তার জীবন সংশয়ও হতে পারে।

তথাপি লোর ধাইকে অত্যন্ত অনুনয়ের সঙ্গে জানাল চন্দ্রাণীর সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটিয়ে দেওয়ার কথা। লোরের অনুনয় অগ্রাহ্য করতে না পেরে ধাই তাঁকে জানিয়ে দিল সেই সঙ্কেত স্থানে গমনের কথা।

অতঃপর যথাসময়ে ধাইয়ের নির্দেশমত সমস্ত কিছু সংঘটিত হল। মন্দিরে উপস্থিত হয়ে দেবীপূজার ছলে লোর ও চন্দ্রাণীর কটাক্ষে দৃষ্টি বিনিময় হল। তথাপি মন যেন কিছুতেই শান্ত হয় না। সামনাসামনি সাক্ষাতের অভিলাষে শেষপর্যন্ত কৌশলে চন্দ্রাণী দেবীকে প্রদক্ষিণ করার ছলে দেবীর পিছনে গিয়ে কণ্ঠের নবরত্নমালা ছিঁড়ে ফেলল। ঠিক সেই সময় যখন সঙ্গের সখীরা মাটির দিকে মুখ করে রত্ন কুড়োতে ব্যস্ত, তখন আত্মীয় পরিজন ও সখীদের সমবেত দৃষ্টি এড়িয়ে তাদের চারচোখের আকাঙ্ক্ষিত মিলন সম্ভব হল। দুজনেরই মন জুড়োল, প্রাণ শান্ত হল।

✤ লোর ও চন্দ্রাণীর মিলন ✤

এরপর লোর তাঁর ছলনাশ্রিত ধ্যান ভঙ্গ করে যোগীবেশেই ঘরে ফিরে এলেন। তারপর চন্দ্রাণীর বাসস্থানের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে চন্দ্রাণীর দ্বারদেশে এসে উপনীত হলেন। দেখলেন চন্দ্রাণীর প্রাসাদে প্রবেশ করা বড়ই দুঃসাধ্য। একথা মনে মনে চিন্তা করতে করতে রাজা এক উপায় উদ্ভাবন করলেন।

তিনি খন্ড খন্ড দড়ি যুক্ত করে এক বিরাট দড়ি তৈরি করলেন এবং দুহাত অন্তর তাতে একটি করে কাঠের টুকরো আঁটকে দিলেন। দড়ির এক প্রান্তে লাগালেন লোহার বঁড়শি। তারপর রথে চড়ে তিনি চন্দ্রাণীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

প্রাসাদের প্রতি দ্বারে দ্বারে দ্বারীর সতর্ক প্রহরা সত্ত্বেও রাজা লোর সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে নিজের অভীষ্ট সাধনে তৎপর হলেন। চন্দ্রাণীর ঘরে দেওয়ালের দিকে রাজা দড়ি ছুঁড়লেন, দেওয়ালের পাথরে আটকে গেল বড়শি। সখীরা তা দেখতে পেয়ে বড়শি উপড়ে ফেলল।

এই ঘটনা যখন চন্দ্রাণীর চেতনায় এল তখন তার আফশোষের সীমা রইল না। প্রাণের নিধিকে যে হাতে পেয়েও এমন করে হারাতে হল এই অনুশোচনাই তাকে তীব্রভাবে মর্মবিদ্ধ করতে লাগল। দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাল যে নৃপতি যেন আর একবার তাঁর বড়শি নিক্ষেপ করে।

এদিকে বড়শি খসে যাওয়ার ঘটনায় লোরও ততোধিক লজ্জিত হয়ে শুভ কাজের প্রথমেই বাধার আশঙ্কায় কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়লেন এবং ভাবলেন—যেহেতু বাধা পড়েছে সেহেতু সেদিন আর কোনভাবেই চন্দ্রাণী সঙ্গ সম্ভব নয়। এই মনে করে তিনি তাঁর বড়শি দড়ি সব গুটিয়ে নিলেন, এবং নিজের শিবিরে ফিরে যাবার আয়োজন করতে লাগলেন।

এমত অবস্থায় সারথি মিত্রকণ্ঠ রাজাকে বোঝাল যে মাত্র একবারের ব্যর্থতায় ফিরে যাওয়া পৌরুষের কর্ম নয় বরং বার বার চেষ্টার বিনিময়ে ইষ্টলাভ করাই যথার্থ গৌরবের কাজ। একথা শুনে লোর পুনরায় বঁড়শি নিক্ষেপ করলেন। পুনরায় সখীরা কোদাল দিয়ে আবার তা উপড়ে ফেলল। দ্বিতীয় বারের ব্যর্থতা লোরকে যেন অবসাদগ্রস্ত করে ফেলল।

লজ্জিত লোর বঁড়শিক্ষেপণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করল। তাঁর মনে হল—নিজের উদ্ভাবিত উপায়ের বাধা হয়ে দাঁড়াল যেন সে নিজেই। এদিকে লোরের ব্যর্থতা চন্দ্রাণীর দুঃখকে আরও ঘনীভূত করল। চন্দ্রাণীর মনে হল লোরের এই ব্যর্থতা যেন চন্দ্রাণীরই মন্দ ভাগ্যের ফল। তা না হলে এই ভরা যৌবনকালে কামবাসনা নিবৃত্তির উপায় হাতের কাছে পেয়ে কেন তা হারিয়ে যাবে?

নিরুপায় চন্দ্রাণী অবশেষে সর্বশক্তিমান নিরঞ্জনের স্তব করতে শুরু করল। একমনে ঈশ্বরের স্তব স্তুতি করার পর সে লোরের সঙ্গে তার মিলনের বর প্রার্থনা করল ঈশ্বরের কাছে।

যুবতীর প্রার্থনা সফল হল। লজ্জিত লোরের মনে পুনরায় বঁড়শিক্ষেপণের ইচ্ছা জাগল। চন্দ্রাণীর পুণ্যফলে সে বঁড়শি আর যেন না খসে যায় এই বাসনায় লোর পুনরায় বঁড়শি ক্ষেপণ করলেন। বজ্র যদি কৈলাস শিখরকে ভেদ করে তাহলে তার শক্তি যতখানি হয়, সেই সম পরাক্রমে লোরের ক্ষেপিত বড়শি চন্দ্রাণীর শয়নমন্দিরে দেওয়াল আঁটকে রইল। বীর লোরের অসাধারণ বিক্রম দেখে চন্দ্রাণীরও আর আনন্দের সীমা রইল না।

সখীরা পরখ করে দেখল বড়শি ঠিকমতো আঁটকেছে কিনা। মিলনের প্রাথমিক আয়োজন যখন সম্পূর্ণ, চন্দ্রাণী তখন সখীসঙ্গে শয়নমন্দিরে প্রবেশ করে একইরকমের

চারটি শয্যা রচনা করল সোনার তৈরি চারটি খাটে। অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত করা হল সেই চারটি শয্যাকে। কুসমে, সুগন্ধে-চন্দনে-চাঁদোয়ায় রতিরণরঙ্গের মনোমুগ্ধ উপচারে মিলনের পরিবেশ হল সুসম্পূর্ণ। সেই চার শয্যার মধ্যে চন্দ্রাণী তিনটিতে শয়ন করাল তারই তিন সখীকে। তাদের বসন-ভূষণ-সাজ-সজ্জা সবকিছুই চন্দ্রাণীরই অনূরূপ। তিন সখী আর চন্দ্রাণী—এই চারজনকে একসঙ্গে দেখলে বোঝার উপায় নেই যে কে কোন জন কিংবা শ্রেষ্ঠই বা কোন জন?

অবশেষে রাজা লোর দড়ি অবলম্বন করে চন্দ্রাণীর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করলেন। সেখানে মিলনের পরিপূর্ণ আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রাণীর ছলনার আয়োজন ও তো কিছু কম ছিল না। তাই শয়নকক্ষে প্রসন্ন বদনে প্রবেশ করেই লোরের তো হতবুদ্ধির দশা। দেখেন একইরকমের চারটি খাটে এবং বসন-ভূষণ পরিহিত একই রকমের চার নারী, তাদের আপাদমস্তক একই আবরণে ঢাকা। কক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে লোর কিছু সময় চিন্তা করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন—এ চন্দ্রাণীরই ছলনা। কিন্তু এদের মধ্যে চন্দ্রাণীকে খুঁজে বের করাও অসম্ভব। আবার যদি ঠিকমত চিনতে না পেরে অন্য নারীর শয্যায় গমন করেন, তাহলেও নারীদের উপহাসের পাত্র হবেন তিনি। সামান্য নারীর কাছে বীর লোরের পরিচয় হবে মূর্খ লোর হিসেবে। আর নারীর কাছে পরাজয়ে পুরুষের পৌরুষত্বও হ্রাস পায়। অতএব কিংকর্তব্যবিমূঢ় লোর কীভাবে আপন পৌরুষ বাঁচিয়ে অভীষ্ট সিদ্ধ করা যায় তারই উপায় চিন্তা করতে লাগলেন।

দেবতাকে স্মরণ করে লোর ভাল করে সেই চার খাটের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সব কিছু নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। হঠাৎই দৃষ্টি এসে পড়ল চাঁদোয়ার বন্ধন রশির দিকে। দেখলেন তিনটি খাটের চাঁদোয়ার বন্ধনের দড়িটি নতুন, শুধু একটি চাঁদোয়ার দড়ি পুরোনো।

নিজ বুদ্ধির কৌশলে লোর সেই খাটেই উপবেশন করলেন। তখন শয়নগৃহে ধন্য ধন্য রব উঠল। সখীরা নিজের নিজের শয্যা ত্যাগ করে এসে লোর ও চন্দ্রাণীর সেবায় নিযুক্ত হল। সেই রসমন্দিরে সখী পরিবেষ্টিত লোরকে দেখে গোপীজন পরিবৃতা গোপালের মতোই মনে হচ্ছিল।

এরপর শুরু হল যুবতী চন্দ্রাণীর আকাঙ্ক্ষিত যৌবনের বহুলালিত আবেদনের পরিপূর্ণ নিবেদন আর পরিপূর্ণতা গ্রহণের কামলীলা। কামশাস্ত্রে নিয়ম বা রীতি অনুযায়ী ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি রসক্রীড়ার মধ্যে দিয়ে গাঢ় অনুরাগে রতিক্রীড়ায় মত্ত হল লোর ও চন্দ্রাণী।

অবশেষে রতিক্রীড়া সমাপনান্তে রাত্রি চতুর্থ প্রহরে পরিতৃপ্ত শীতল মনে নিদ্রালসা দুজন দুজনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। দুজনেরই অঙ্গ জুড়ে তখন কামকলার নানা নির্দশন। প্রতি অঙ্গের লাগি প্রতি অঙ্গের যে ক্রন্দন, এতদিনে ঘটল তার যথার্থ উপশম। ধীরে ধীরে উভয়েই প্রতিটি অঙ্গের বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে নিজেদের মুক্ত করল। লোর চন্দ্রাণীকে কথা দিলেন যে, তাঁরা দুজনেই এই সুমধুর রাত্রে যে প্রেমের অঙ্কুর বপন করলেন তা সারাজীবনই উভয়ের মনের মধ্যে লালিত হবে—হারিয়ে যাবে না। এই বলে নৃপতি লোর রথে আরোহন করে নিজ শিবিরে ফিরে গেলেন। সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন যৌবনের তৃপ্তি আর চন্দ্রাণীর স্মৃতি।

✤ লোরচন্দ্রাণীর পলায়ন ✤

লোর ও চন্দ্রাণীর এই গোপন মিলন এবং রতিরঙ্গক্রীড়া এইভাবে ক্রমশ চলতেই লাগল। তিলেকের বিচ্ছেদও আর দুজনের সহ্য হয় না ক্রমশ চার দিন চার রাত তারা একসঙ্গে কাটাল ; এবং ধীরে ধীরে রাজা লোর নিরাতঙ্ক মনেই চন্দ্রাণীর কাছে আসা যাওয়া করতে লাগল।

নিদ্রাহারা অনেক নিশি কৌতুকে কাটানোর পর একদিন তারা খবর পেল মৃগয়া শেষ করে বামন এবার দেশে ফিরে আসছে। চন্দ্রাণীর মনে আতঙ্ক ও লজ্জা উভয়েই নিদারুণ প্রভাব বিস্তার করল। তার কেবলই মনে হতে লাগল—বামন এসে যদি চন্দ্রাণীর ঘরে প্রবেশ করে তাহলে এই লজ্জিত মুখ নিয়ে সে কি করে বামনের মুখের দিকে চাইবে ? বামন যদি এই সমস্ত রহস্যের খবর পায় বা জানতে পারে তাহলে সেই মুহূর্তেই চন্দ্রাণীকে সে প্রাণেই মেরে ফেলবে কেননা বামন আকৃতিতে খর্ব হলেও পরাক্রম বা দর্পের দিক থেকে তার সমকক্ষ বীর নেই বললেই চলে। তাই নৃপতি লোরের জন্য তার চিন্তার অন্ত নেই। সে তাই নৃপতি লোরের কাছে আফশোস করে বলেছে যে তার জন্যেই রাজ্যেশ্বর লোরের এই হেনস্থা। আর সেও তিলেকের সুখের জন্যে মানসম্ভ্রম, লজ্জা, জাতি কুল সবকিছুর মুখে চুনকালি দিয়েছে, মর্যাদা নষ্ট করেছে।

কুমারীর বিলাপ শুনে নৃপতি লোর তাঁর নিজ পরাক্রমের কথা স্মরণ করে চিন্তামুক্ত মনে চন্দ্রাণীকে জানালেন যে—লোরের দেহে প্রাণ থাকতে চন্দ্রাণীর কোনও চিন্তা নেই। বামনের সঙ্গে সম্মুখ সমরে বামনকে পরাস্ত করে লোর চন্দ্রাণীকে লাভ করবে। অতএব চন্দ্রাণী যেন এ ব্যাপারে নিজেকে অপরাধী ভেবে দোষী সাব্যস্ত না করে সখীদের সঙ্গে কৌতুকে প্রবৃত্ত হয়।

রাজার মুখে একথা শুনে চন্দ্রাণীর মনে ভরসা এল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হতে লাগল যে, যে কাজ তারা করতে চলেছে, তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এর ফলস্বরূপ জীবনের মতো জঘন্য কলঙ্কের বোঝা তার মাথায় চাপবে। লোকে গায়ে থুতু দিয়ে বলবে যে উপপতির মোহে চন্দ্রাণী নিজের পতির প্রাণহরণ করেছে। জীবনে যদি কলঙ্কের ছাপই রইল তাহলে বেঁচে থেকেই আর কি লাভ ? কেননা কলঙ্কের ভয়েই রামায়ণে সীতার পাতাল প্রবেশ ঘটেছিল। তাই প্রাণসংহারের মতো নীচ কাজ না করে লোর যদি বামন এসে পৌঁছানোর আগেই তার অর্থাৎ চন্দ্রাণীর জীবন রক্ষা করে তাহলেই তা হবে বীরোচিত কাজ। অতএব চন্দ্রাণীকে নিয়ে লোর যদি পলায়ন করে, তাহলে তাতে কলঙ্কের ভয়ও থাকবে না আর প্রাণহানিও ঘটবে না।

চন্দ্রাণীর এই কথা শুনে লোর তখনি রথ প্রস্তুত করতে অগ্রসর হলেন এবং রথ প্রস্তুত করে চন্দ্রাণীকে নিয়ে তাতে চড়ে বসলেন। তারপর সারথিকে নির্দেশ দিলেন বিলম্ব না করে জোরে রথ চালাতে। কেননা পথে যদি বামনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাহলে সে কখনোই তাদের ছেড়ে দেবে না। অতএব সেই যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে।

এদিকে রাজঅন্তঃপুরে চন্দ্রাণীকে দেখতে না পেয়ে চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। রাজা ও রাজমাতা চিন্তান্বিত মুখে ভাবতে লাগল যে, দেশত্যাগ করে চন্দ্রাণী সমস্ত কুলের ওপর এক বিরাট কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গেল।

এই বলে রাজমাতা কাঁদতে শুরু করল এবং রাজমাতার সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরে কান্নার রোল উঠে গেল।

ঠিক এই সময় দেখি বামনও ভার্যার পলায়ন বৃত্তান্ত শুনে প্রথম অবস্থায় কিছুটা আকুল হয়ে পড়ল। তারপর ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হয়ে নিজমূর্তি ধারণ করল। এদিকে আবার চর এসে খবর দিল যে অভ্যাগত রাজারা সবাই যে যার স্থানে অবস্থান করছেন শুধুমাত্র লোররাজই তাঁর শিবিরে নেই।

একথা শুনে বামনের রাগ এবং ক্ষোভ দুইই গেল প্রচন্ডমাত্রায় বেড়ে। তার বুঝতে আর বাকী রইল না যে—এ কাজ লোরেরই। প্রচণ্ড ক্রোধে, ক্ষোভে সে তখন পত্নী উদ্ধারের জন্যে লোরের উদ্দেশ্যে রওনা হল।

❖ লোরচন্দ্রাণীর সন্ধানে বামনের অভিযান ❖

যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হল বামনের সৈন্যদল। শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি ইত্যাদি বাজনার সঙ্গে শুভ সূচনা হল লোরের প্রতি প্রতিশোধস্পৃহার। বামনের রথের সারথি বজ্রবাহুকে বামন নির্দেশ দিল বেছে বেছে তীক্ষ্ণধার অস্ত্র রথে তোলার। দলবল সৈন্যসামন্ত ইত্যাদির সঙ্গে বামনও সজ্জিত হল রণসাজে। বামনের বীরত্বের কোনও তুলনা নেই। যদি কেউ তার সঙ্গে সহযোগিতা নাও করে তথাপি একাই যুদ্ধ জয় করার মতো হিম্মৎ সে রাখে। কেননা কোনদিনই অন্যের সহায়তা লাভ করে সে কোনও কাজ করেনি।

জল-স্থল-রাজ্য-দেশ সবই তার বশবর্তী। কাজেই লোরের শরণাগত হয়ে থাকবে এমন সাহসও কারো নেই। নারী চোরের বনেও জায়গা নেই কেননা জঙ্গলে চন্দ্র-সূর্যের হাতেও তার নিস্তার নেই। মহাভারতে দ্রৌপদীর প্রতি লুব্ধতার জন্যে ভীমের হাতে যেমন বিরাট রাজশ্যালক কীচক নিহত হয়েছিল, ঠিক তেমনি লোরেরও মৃত্যু অবশ্যই বামনের হাতে। কিম্বা তা যদি না হয় তাহলে লোরের হাতে বামনের মরণ কেননা বিধাতার নির্বন্ধ কেউই খন্ডন করতে পারে না।

বামনের কথা শুনে সারথি রথ ছোটালেন মহারণ্যের দিকে। তিন দিন রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রমে রথ ছোটানোর পর পরের দিন অরণ্যে পাওয়া গেল এক রথের ঠিকানা। অনুমানে ধরা গেল ওটি লোরেরই রথ। কেননা রথের সাজসজ্জার আতিশয্য অর্থাৎ সোনার পতাকা, ভীতিহীন গতি এসবই দেবরাজ ইন্দ্রের রথের মতোই সামঞ্জস্যপূর্ণ। বীরের লক্ষণ পরিচিত হয় অস্ত্রসজ্জায় বহরেই। এ লক্ষণও রথটিতে বর্তমান। অতএব এ যে নারীচোরা লোরেরই রথ—এতে কোনও সন্দেহ নেই।

অতএব বামনের নির্দেশে সারথি লোরের রথের আগে বামনের রথ দাঁড় করাল, লোরের রথের গতিরুদ্ধ করে। লোরের মুখ দেখা মাত্রই সিংহনাকে বামন গর্জন করে উঠল এবং লোরকে 'স্ত্রী চোর' বলে সম্বোধন করল। বামন তাঁকে আরও বলল যে, যে ব্যক্তি পরনারী হরণ করে তার দুর্গতির অনিবার্য পরিণাম মৃত্যু। প্রজাপতি বংশজাত রাজা রাবণ যেমন ত্রিভুবনের অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে গেছিল এই অন্যের স্ত্রী হরণ করার জন্যেই, লোরেরও পরিণতি যেন তাই-ই। বীরের রমণীর সঙ্গে এই ধরনের সঙ্গরসিকতা মোটেই অভিপ্রেত নয়। এই সব বলে বামনের আস্ফালন উত্তরোত্তর বেড়েই চলল।

বামনের সুদীর্ঘ আস্ফালনের শেষে লোর বামনকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে, বামন নিজে বোধ হয় একজন সজ্জন ব্যক্তি তাই এতক্ষণ চোরের নিন্দা করে গেল। বামনকে বিদ্রূপ করে আরও বললেন যে ব্যাধের কাজ করে বামন মহাসাধুর কর্মই করছে। নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে বনে বসে বসে কেবলমাত্র পশু শিকার করাই তার একমাত্র কাজ। পর্বতপ্রমাণ নিজের দোষের দিকে না তাকিয়ে সে শুধু পরের ছোটখাটো দোষ দেখতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

নিজের প্রিয়াকে সুখী করাই হল উত্তম পুরুষের লক্ষণ। এর ব্যতিক্রম যে ঘটায় সে কাপুরুষ নপুংসক। পুরুষ ভ্রমর জাতি, সে সুগন্ধী পুষ্প দেখলেই তার মধু আহরণ করতে যাবে, এতে অন্যায়ের কিছু নেই। কিন্তু যে বনের পশুর মতোই বনচারী হয়ে বনে থাকে,

রমণীর রমনক্রিয়ার কোনও ব্যবস্থাই করে না সে নরাধম। বামনের দুর্ভাগ্য যে তার পত্নী তার মতো স্বামীকে স্বামী বলে মানতে রাজী নয়। যেখানে দেব-দানব-গন্ধর্ব-পশু-নর সকলের ক্ষেত্রেই গৃহধর্ম রক্ষা করার জন্যে রতিসম্ভোগ অনিবার্য ব্যাপার এবং এছাড়া জগতের সৃষ্টিরক্ষাই সম্ভব নয় সেখানে বামন এই ক্রীড়ায় অক্ষম। সুন্দরী রমণী যদি কোনও পুরুষকে কামনার সঙ্গ ইচ্ছে করে তাহলে সেই পুরুষেরও উচিত, নারীকে তার কামযন্ত্রণা থেকে মুক্ত করা। অতএব বামনের লোরকে চোর বলার কোনও অধিকার নেই কেননা তার স্ত্রী স্বেচ্ছায় লোরের শরণাপন্ন হয়েছে।

বামনের কাজ শুধু বনের পশু মেরেই বীরত্বের দর্প করা। সাহস থাকলে বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করে সে তার পরাক্রম দেখাক। লোর বললেন যে তিনি তাঁর বাণ দিয়ে বিদ্ধ করে বামনের রক্ত পান করবেন তবেই তাঁর তৃপ্তি, আর বামনের মাংস তিনি ছড়িয়ে দেবেন—শিয়াল-শকুন ইত্যাদির মধ্যে তবেই হবে লোরের পরম শান্তি।

✤ যুদ্ধ বর্ণনা ✤

এরপর শুরু হল সেই মহারণ। দাঁতে দাঁত চেপে দুই মহারথী মুখোমুখি হলেন। রাজা লোর সারথিকে নির্দেশ দিলেন যে দুই রথের মধ্যে যেন যথেষ্ট দূরত্ব বজায় থাকে, কখনোই দুটি রথ যেন কাছাকাছি না চলে আসে। যেহেতু তাঁর রথে চন্দ্রাণী আছে সেহেতু বামন তাকে হরণ করার জন্যে রথকে কাছাকাছি আনতে চাইবে কিন্তু তা যেন কখনোই না আসে। সবেগে তীরক্ষেপণ করে শত্রুর সংহারকরার মতো যেন যথেষ্ট দূরত্ব বজায় থাকে।

লোরের কথামত সারথি রথকে যুদ্ধের সুবিধার্থে যথাযথ দূরত্বেই রাখে। বামন তখন চোখা চোখা বাণ মেরে লোরকে বধ করার জন্যে উদগ্রীব হয়। সেই মহারণ দেখতে আশেপাশের বনবাসী মুনি ঋষিরা সকৌতুকে সেখানে এসে উপস্থিত হয়।

পত্নী বিচ্ছেদের ব্যথায় বামন লোরের হৃদয় লক্ষ্য করে দিব্য বাণ মারে ; বীররাজা লোর ক্ষিপ্রহস্তে সেই বাণ নিবারণ করলে বামন লজ্জায় অধোবদন হয়। পুনরায় দ্বিগুণ ক্রোধে বামন লোরকে বধ করার বাণ নিক্ষেপ করে। লোর সেকথা বুঝতে পেরে মাঝপথেই তাঁর বাণ দিয়ে বামনের বাণের গতি রোধ করে। পুনঃ পুনঃ ব্যর্থতা বামনকে আরও হিংস্র করে তোলে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে পুনরায় ধনুকে লোর সংহারের বাণ সংযুক্ত করে।

পুনঃ পুনঃ বজ্রসম বাণ চালনা করে অবশেষে তিন বাণে লোরকে এবং চার বাণে লোরের রথের সারথিকে একেবারে বিধ্বস্ত করে ফেলল। সারথি তখন লোরকে বলে যে বামন অত্যন্ত রণনিপুণ, তাকে কৌশলে বুদ্ধি খাটিয়ে মারতে হবে। লোরের গায়ে বাণ বিদ্ধ হতে দেখে চন্দ্রাণীও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। কোন কাজই বিলম্বে করা উচিত নয়।

সারথির কথা শুনে রাজা লোর রাশি রাশি উপযুক্ত বাণ বেছে নিয়ে বামনকে মারতে শুরু করে এবং বলে যে কোথায় বামনের সেই দর্প ? যাকে চোর বলে অপমান সে করল সেই চোরের যাকে নিজেই আরোগ্য করে তোলবার কোনও ক্ষমতার কথা তার জানা নেই। এ যেন বীরকূলের কলঙ্ক। লোর আরও বললেন যে, 'তবু আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, যুদ্ধ বন্ধ করে দেব, তুমি সুস্থভাবে ভালভাবে ঘরে ফিরে যাও। পশুর মতো বনে বনে না ঘুরে নিজের আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে ফিরে যাও।'

কিন্তু লোরের এই হিতবাক্য যেন আগুনে ঘি পড়ার মতো কর্ণশূল হয়ে বামনের কানে ঝরে পড়ল। ক্রোধে রক্তবর্ণ বামন তথাপি নিজের গর্ব না ছেড়ে লোরকে শরজালে আবদ্ধ করল। এইভাবে দেখতে দেখতে উভয়ের বাণ চালাচালি এমন এক পর্যায়ে পৌছল যেখানে বাণে বাণেই সারা আকাশ এমনভাবে ছেয়ে গেল যে দিনের বেলাতেও দিবাকরকে আর বুঝি দেখা যায় না।

অতঃপর বামনের তেজোময় তীক্ষ্ণবাণে চারিদিক থেকে বাণ এসে লোরকে আক্রমণ করল। বামনের সুতীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে লোরের সর্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। প্রচণ্ড ব্যথায় লোরের হাতের ধনুক খসে পড়ল। সেই সুযোগে বামন ঘন ঘন শরক্ষেপণ করতে লাগলনে সারথিকে বধ করবার জন্যে। নিরুপায় সারথি মিত্রকণ্ঠ পড়ে গেলেন মহাবিপদে।

একদিকে চন্দ্রাণীর কাতরতা, অন্যদিকে রথের টালমাটাল অবস্থা—আবার আর একদিকে বিপক্ষের প্রচণ্ডতা। তিনি কোন দিক রক্ষা করবেন কিছুই বুঝতে পারলেন না।

অবশেষে এই মহাসংকটসময়ে মিত্রকণ্ঠের মনে হল যে, কৌশলে শত্রুকে করায়ত্ত করার নিয়ম রণরীতিতে আছে বলে তিনি গুরুজনের মুখে শুনেছেন। একথা মনে করেই তিনি চন্দ্রাণীর পরনের একখণ্ড কাপড় শরে বেঁধে বামনের উদ্দেশ্যে শরক্ষেপণ করলেন। বামনের কাছে সেই শর পৌঁছালে বামন ভাবল যে তারই বাণের আঘাতে হয়তো চন্দ্রাণীর মৃত্যু ঘটেছে। তখন চন্দ্রাণীর সঙ্গে তার পূর্ব প্রেমপ্রীতির অনেক স্মৃতি ধীরে ধীরে মনে হতে লাগল। যার ফলে চন্দ্রাণীর প্রতি এই দ্রবীভূত মনে তার মনে হল যে চন্দ্রাণীরই যদি মৃত্যু ঘটল তাহলে আর যুদ্ধ করেই কি লাভ? এই ভেবে সে ধনুর্বাণ ত্যাগ করল।

এই সুযোগে সারথি মিত্রকণ্ঠ অচেতন লোরের চৈতন্য করিয়ে লোরকে সবিস্তারে সব কিছু বলে তাঁকে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে বললেন। চন্দ্রাণীও লোরের দুর্বলতা লক্ষ্য করে তাকে কিছু গঞ্জনা দিল। সেই গঞ্জনা লোরের পৌরুষে আঘাত হানল। তিনি তখন উঠে বসে ধনুকে শরসংযোগ করে বামনের উদ্দেশ্যে চোখা চোখা বাণ ছুঁড়তে শুরু করেন। সেই ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাতে হতচকিত বামন ক্রমশ শিথিল হতে থাকল। তার এই পরাভবে বনের মুনি ঋষি সকলেই কৌতুক প্রকাশ করতে লাগল। লজ্জিত বামন তখন মনে মনে লোরকে নিধনের উপায় চিন্তা করতে লাগল।

এরপর বীর বামন রাজা লোরকে আর হাতে ধনুক ধরার অবসরটুকুও দিল না। যেমনি লোর হাতে ধনুক ধরে অমনি বামন তার বাণ দিয়ে তা কেটে দেয়। লোর লজ্জিত হন। খর্ববীর উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠে।

অতঃপর লোর পুনরায় তাঁর ধনুকে ব্রহ্মাস্ত্র শর যোজনা করেন বামনকে সংহার করার উদ্দেশ্যে। তাঁর জন্মজন্মান্তরের সমস্ত পুণ্যফলকে একত্রে স্মরণ করে এই বিজয়ী বাণ ক্ষেপণ করলেন। সে বাণ বামনের শরীর মন সব কিছু ভেদ করে হৃদয় বিদীর্ণ করল। বামন 'ধন্য ধন্য লোর মহাবীর' বলে সংজ্ঞাহীন হল। সংজ্ঞা হারাবার আগে লোরের গুণকীর্তন করে লোর ও চন্দ্রাণীকে সুখে রাজত্ব করার অনুমতি দিয়ে স্বর্গে গমন করল।

✤ চন্দ্রাণীকে সর্পদংশন ✤

বনের পথে চলতে চলতে ক্লান্ত অবসন্ন চন্দ্রাণী লোরকে অনুরোধ করে বলল যে সে অত্যন্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত, অবসন্ন এবং নিদ্রা ও তৃষ্ণাকাতর। কাজেই রথ দাঁড় করিয়ে যদি একটু বিশ্রাম নেওয়া যেত তাহলে তার পক্ষে হয়তো সুবিধে হত। তৃষ্ণাকাতর চন্দ্রাণীকে দেখে একটি গাছের তলায় রথ দাঁড় করিয়ে লোর জলের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে কাছেই এক সরোবর দেখতে পেলেন।

সেই সরোবরে স্নান ও জলপান করে তারা তিনজনেই সরোবরের তীরে বসে বিশ্রাম নিলেন। মিত্রকণ্ঠ ঘোড়াকেও একটু জল খাইয়ে নিকটবর্তী বনের আশ্রমে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য গেল। এদিকে চন্দ্রাণী লোরের কোলে মাথা রেখে নিদ্রা গেল এবং লোরও গাছের তলায় হেলান দিয়ে বসলেন ঢুলঢুলু আঁখি নিয়ে।

ঠিক সেই সময়ে কোথা থেকে এক সাপ এসে ঘুমের মধ্যেই চন্দ্রাণীকে দংশন করল। চন্দ্রাণী যন্ত্রণায় কাতর হয়ে লোরের শরণাপন্ন হল। চন্দ্রাণীর শরীরে বিষক্রিয়ার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখে লোর মূর্ছিত হলেন। ব্যগ্রচিত্তে মিত্রকণ্ঠ লোরের জ্ঞান ফিরিয়ে এনে বিপদের সময় তাঁকে ধৈর্য ধরে সব কাজ করতে বলল। এই বলে লোরকে চন্দ্রাণীর পাশে বসিয়ে সে ওযুধের সন্ধানে গেল।

ওযুধের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে মিত্রকণ্ঠ অনেকটা দূরে এসে পড়ল। এদিকে একা লোর চন্দ্রাণীকে বার বার দেখতে লাগলেন। তার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বুঝতে না পেরে ভাবলেন বুদ্ধি তার 'দোসর পরাণী' মারাই গেল। ফলে লোর ভেবেই নিল যে চন্দ্রাণী যদি না থাকে তো তাঁর অনিত্য সংসারে বেঁচে থেকে লাভটাই বা কি?

✤ লোরের বিলাপ ✤

কালনাগের দংশনে সংজ্ঞাহীন চন্দ্রাণীকে সামনে রেখে তাঁর শোকে হতচকিত লোর বিলাপ করে বলতে লাগলেন যে চন্দ্রাণীকে ছাড়া তিনি কেমন করে প্রাণধারণ করবেন। চন্দ্রাণীর সারা অঙ্গ বিষে জর্জরিত, নাক মুখ দিয়ে রক্ত বয়ে যাচ্ছে। এমন মর্মবিদায়ী দৃশ্য দেখে তাঁর আর কতক্ষণই বা ধৈর্য্যের ঠিক থাকে?

পুর্বঘটিত সমস্ত কথা লোরের মনে পড়তে লাগল। অবোধ মন সব কিছু জেনে বুঝেও বারে বারে নিজের অজান্তে কেবলই বলে উঠতে লাগল—"উঠ উঠ চন্দ্রমুখী কত নিদ্রা যাও।" মধু ছাড়া মধুকরের যেমন উপবাসে দিন যায় ঠিক তেমনি চন্দ্রাণীর মুখে রসময়ী হাসি নেই বলে লোরের প্রাণ ও যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। স্বগতোক্তি করে লোর যেন নিজের মনের সঙ্গেই কত কথা বলে যাচ্ছেন। লোরের আক্ষেপ যে তিনি রাজ্য সুখ ত্যাগ করে, ময়নামতীর মতো পত্নীকে পরিত্যাগ করে চন্দ্রাণীর প্রেমে দিশেহারা হয়েই বনে উপবনে ঘুরে বেড়ালেন। দেবী মন্দিরে ছলনা করে যোগিবেশ ধারণ করলেন। এসবই চন্দ্রাণীর জন্যে। শেষে চন্দ্রাণীর দর্শন পেয়ে লোরের জীবন ধন্য হয়েছিল। সেই চন্দ্রাণীর আজ এ কী দশা হল। দিশেহারা নৃপতি লোর সেই আত্মীয়-স্বজন, বন্দু বান্ধব পরিত্যক্ত বনে ঠিক বুঝে উঠতেই পারলেন না যে কি তিনি কি করবেন?

তাঁর প্রাণের দোসর মিত্রকণ্ঠই বা কোথায় গেল? চন্দ্রাণী বিহনে তিনি যেন একেবারেই একলা হয়ে গেলেন। সুগন্ধি কুসুম দিয়ে যার শয্যা রচিত হত সেই কিনা আজ ভূমিশয্যায় শায়িতা। সুবাসিত চাঁদোয়া যার আচ্ছাদন, সেই সুন্দরী কিনা গাছের তলায় প্রাণত্যাগ করল।

অনেক চেষ্টা করেও মিত্রকণ্ঠ চন্দ্রাণীর আরোগ্যলাভের কোনও ওষুধ খুঁজে পেল না। অতএব সে ধরেই নিল যে চন্দ্রাণীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং সেই সঙ্গে চন্দ্রাণীর শোকে লোরের মৃত্যুও অনিবার্য। আবার লোরের যদি মৃত্যু ঘটে তাহলে মিত্রকণ্ঠ নিজেও জীবন ত্যাগ করবেন। অতএব এক কালনাগের বিষে তিনের মরণ। লোর তারই আশায় পথ চেয়ে রয়েছেন, কোন মুখে সে খালি হাতে ওষুধ না নিয়ে রাজার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। তার এতদিনের ধর্ম-কর্ম-তন্ত্র-মন্ত্র সবই কি তবে মিথ্যা হয়ে গেল? এইসব কথা ভাবতে ভাবতে লোর স্বচ্ছ সরোবরের জলে ডুবে প্রাণত্যাগ করবে স্থির করল। এবং জলে নেমে পূর্বমুখী হয়ে একমনে সূর্যের স্তব করতে শুরু করল। একমনে সূর্যের ধ্যান করতে করতে সূর্যদেবের অপার করুণায় সূর্যের জ্যোতি-দর্শন করল এবং সেই জ্যোতির্মণ্ডল মধ্যে এক তপস্বীর দর্শন পেল। মহাতেজোময় তাঁর দেহ। তিনিও ভগবান বিষ্ণুর মতো শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী।

ধীরে ধীরে তপস্বীর সেই মহারুদ্ররূপ শান্ত হয়ে সমাহিত রূপ ধারণ করল। মিত্রকণ্ঠকে জল থেকে তীরে নিয়ে এসে তিনি তার প্রাণত্যাগ করার এই বাসনার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

যোগীবরের কাছে আশ্বাস পেয়ে মিত্রকণ্ঠ সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তারে যোগীর কাছে বর্ণনা করল। যোগীবর সব শুনে লোর ও চন্দ্রাণীকে দেখতে চাইলেন। এবং মিত্রকণ্ঠকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে—তাঁর কাছে মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্রের জোরে মৃত মানুষও পুনরায় বেঁচে ওঠে।

মিত্রকণ্ঠ যোগীকে লোরের কাছে নিয়ে এলে যোগী দেখলেন লোরের ধূলিধূসরিত বিপর্যস্ত অবস্থা, কোলে মৃত চন্দ্রাণী। মিত্রকণ্ঠকে দেখে রাজা তাড়াতাড়ি সজাগ হয়ে বসে ওষুধের সন্ধান করলেন এবং ওষধু না পেলে চন্দ্রাণীর সঙ্গে তিনিও প্রাণত্যাগ করবেন বলে জানালেন। মিত্রকণ্ঠ তখন লোরকে ধৈর্য না হারিয়ে অপেক্ষা করতে বলল। লোরকে সান্ত্বনা দিয়ে মিত্রকণ্ঠ জানাল যে, অনেক ভাগ্যবলে লোরের এই সঙ্কটসময়ে একজন সর্বজ্ঞান এবং গুণসম্পন্ন যোগীবরকে পাওয়া গেছে, যিনি লোরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। লোর যেন সব কিছু ভুলে কায়মনোবাক্যে যোগীবরকে সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট করেন। মহাভারতে সৃঞ্জয় রাজার পুত্র স্বর্ণষ্ঠীব যেমন ভাবে মুনির কৃপায় প্রাণ ফিরে পেয়েছিল, এক্ষেত্রে চন্দ্রাণীরও হয়তো সেইরকম হবে। এই বলে মিত্রকণ্ঠ রাজা লোরকে মহাভারতের সেই স্বর্ণষ্ঠীবের কথা বলতে শুরু করল।

❖ স্বর্ণষ্ঠীব উপাখ্যান ❖

সত্যযুগে সৃঞ্জয় নামে একজন রাজা ছিলেন। ধর্মে-কর্মে-খ্যাতিতে-বিক্রমে তিনি ছিলেন শ্রীরামতুল্য। সূর্যের আলো যতদূর পৌঁছায়, সেই সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর ছিলেন তিনি। প্রজাদের তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। সসাগর ধরিত্রীর অধীশ্বর হয়েও তিনি ছিলেন শত্রুহীন। এই যে রাজা সৃঞ্জয়, স্বর্ণষ্ঠীবী হলেন তাঁরই ছেলে।

তাঁর স্বর্ণষ্ঠীবী নাম হওয়ার কারণ কেউ তাঁকে মারলে তাঁর অঙ্গ দিয়ে সোনা ঝরে পড়ত।* রাজা সৃঞ্জয় ইন্দ্রসম বীর আর তাঁরই পুত্রের অঙ্গ হতে এই স্বর্ণ বর্ষণ—এই দুইই যেন বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি।

একদিন অঙ্গিরা আর নারদ মুনি এলেন রাজা সৃঞ্জয়ের কাছে কিছু বলতে। রাজা যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও মর্যাদায় মুনিদের চরণ বন্দনা করে তাঁদের সেবার আয়োজন করলেন।

অত্যন্ত লাবণ্যময়ী যৌবনবতী রাজার এক কন্যা ছিল। সেই কন্যা এসে চরণ স্পর্শ করে মুনিদের বন্দনা করল। অপরূপ লাবণ্যময়ী কন্যাকে দেখে অঙ্গিরা মুনির তপঃক্লিষ্ট মনে মদনের আবির্ভাব হল। মুনি ভাবলেন যে তিনি রাজার কাছে এই কন্যাকে প্রার্থনা করবেন। এমন সময় নারদ অঙ্গিরা মুনির ভাবনাকে কাজে রূপান্তরিত করে রাজার কাছে মেয়েটিকে প্রার্থনা করল। মহারাজ তৎক্ষণাৎ নারদকে কন্যা দান করলেন। এর ফলে অঙ্গিরা মুনি ক্রুদ্ধ হলেন এবং রাজাকে এজন্যে তিরস্কার করলেন। রাজা বললেন যে—নারদ প্রথমে তাঁর কন্যাকে গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, তাই তিনি নারদকে কন্যা দান করেছেন।

যাইহোক এরপর নারদ পত্নীসহ বৈকুণ্ঠে এবং অঙ্গিরা মুনি স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

এইভাবে কন্যাদান করে নৃপতি সৃঞ্জয় প্রচুর দান ধ্যান করে লোকখ্যাতি লাভ করলেন। তাঁরই পুত্র যে স্বর্ণষ্ঠীবী এবং তাকে মারলেই গা থেকে স্বর্ণবর্ষণ হয়—একথা কারোরই অজানা নয়। রাজ্যের কিছু চোর একত্রিত হয়ে পরামর্শ করে একদিন স্বর্ণষ্ঠীবীকে চুরি করে নির্জনে নিয়ে গেল।

ধর্মাধর্ম বোধশূন্য হয়ে সোনার আশায় চোরেরা স্বর্ণষ্ঠীবীকে প্রচণ্ড মারধোর করল। চোরেরা রাজকুমারকে যতই মারতে লাগল ততই তার গা থেকে স্বর্ণবর্ষণ হতে লাগল। এইভাবে মারতে মারতে চোরেরা স্বর্ণষ্ঠীবীকে মেরেই ফেলল। তারা যখন দেখল রাজকুমার মারা গেছে, তখন তারা প্রাণের ভয়ে ধন-প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল রাজকুমারকে ফেলে রেখে।

এদিকে নৃপতি ও তাঁর মহিষী তাদের একমাত্র পুত্রের খোঁজে দিকে দিকে লোক পাঠাল এবং নিজেরাও অত্যন্ত কাতর ও বিমর্ষ হয়ে পড়ল। কুমারের খোঁজে চারিদিকে অনুসন্ধান চালিয়ে শেষে এক নির্জন কাননের কাছে কুমারের মৃতদেহ পাওয়া গেল। তাকে নিয়ে আসা হলে মহিষী তখনই সংজ্ঞা হারাল।

---

* মহাভারতে অবশ্য স্বর্ণষ্ঠীবীর নিষ্ঠীবন ত্যাগের সঙ্গে স্বর্ণবর্ষণের কথা আছে, আঘাতের ফলে স্বর্ণপ্রদানের বৃত্তান্ত নেই।

স্বর্ণষ্ঠীবের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজপুরীতে শোকের রোল উঠল। রাজা-রাণী-প্রজা সকলেই শোকে মুহমান। একথা জানতে পেরে নারদ আকাশপথে সেখানে এসে উপস্থিত হল এবং রাজাকে সান্ত্বনা দিয়ে মৃত্যু যে জীবনের অনিবার্য পরিণাম তা নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করল। পৃথিবীসংসার-রাজ্য পাট সবকিছুই যে কুহকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, মায়ার আবরণ সরে গেলে সকলকেই যে সেই মাটিতেই আশ্রয় নিতে হবে, এ সংসারে সবই যে মায়া-কেউই যে কারো নয়—এইসব দার্শনিক প্রবচনে নানাভাবে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করল রাজাকে। সংসারের অনিত্যতত্ত্ব ব্যাখ্যার শেষে মহামুনি নারদ আসনে বসে তাঁর ধ্যান জপ-তপ সমস্ত কিছুর বিনিময়ে স্বর্ণষ্ঠীবের মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করলেন।

✤ চন্দ্রাণীর পুনর্জীবন ✤

এই গল্প শুনে নৃপতি লোর ঋষির চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে তাঁর প্রাণের দোসর চন্দ্রাণীর জীবনদানের জন্যে অন্তরমথিত প্রার্থনা জানালেন। উত্তরে সদয় হৃদয় ঋষি জানালেন যে লোর যদি সত্যিই তাঁর প্রেয়সীর প্রাণভিক্ষা চান, তাহলে আগে তিনি প্রতিজ্ঞা করুন—বিনিময় মূল্যস্বরূপ ঋষিকে তিনি কি দক্ষিণা দেবেন?

ঋষির কথা শুনে আনন্দিত লোর তৎক্ষণাৎ জল-স্থল-চাঁদ-সূর্য সবকিছুকে সাক্ষী রেখে পিতৃদত্ত রাজ্য-রাজধানী-ধন-দৌলত ইত্যাদি সমস্ত কিছু যা ঋষির মন চায়—তাই দক্ষিণা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তবু সব কিছুর বিনিময়ে তিনি ঋষির কাছে তাঁর প্রিয়ার প্রাণ ভিক্ষা করলেন।

রাজার কথা শুনে তপস্বী জানালেন যে, তিনি বনবাসী তপস্বী। এই সমস্ত রত্ন রাজধানী, রাজসুখ ঐশ্বর্য নিয়ে তিনি কি করবেন? এসবই তাঁর কাছে সাগরের ঢেউয়ের মতোই ক্ষণস্থায়ী মূল্যহীন। এই সমস্ত দামী দামী রত্ন তাঁর কাছে বনের পাথর ছাড়া কিছুই নয়। অতএব রাজার পত্নী যদি পুনর্জীবন প্রাপ্ত হন, তাহলে রাজা যেন এই প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি বারো বছর তাঁর পত্নীর দাস হয়ে থাকবেন, তাকে ছেড়ে যেতে পারবেন না।

ঋষির এই আদেশ রাজা লোর স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন। আনন্দিত তপস্বী তখন চন্দ্রাণীকে পুনর্জীবন দানের আয়োজন শুরু করলেন। তাঁর মন্ত্রধ্বনিতে কম্পিত হল সারা বন, কম্পিত হল পাতালের নাগগণ। কীটের রূপ ধরে তক্ষক এসে তক্ষুণি ঋষির আজ্ঞা প্রার্থনা করল এবং তাঁর ক্রোধ সম্বরণের জন্যে মিনতি জানাল। ক্রোধ সম্বরণ করে ঋষি তখন উত্তরে জানালেন যে তক্ষক যেন তৎক্ষণাৎ সেই সর্পকে প্রেরণ করে যে সর্প চন্দ্রাণীর প্রাণ হরণ করেছে। তক্ষক কম্পমান চিত্তে নিরঞ্জনের স্তব করে ঋষির আজ্ঞা পালন করল। ঋষির মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে অবশেষে চন্দ্রাণী পুনর্জীবনপ্রাপ্ত হল।

চন্দ্রাণী চোখ মেলে তাকাল চন্দ্রের উদয়ে বিকশিত কুমুদের মতোই। সর্পবিষের জ্বালা, বামনের সঙ্গে যুদ্ধ, অরণ্যের পথক্লান্তি সমস্ত বিষাদময়তা যেন চন্দ্রাণীর মনে পূর্বস্মৃতির মতোই আবছা হয়ে এল। সব কিছু ভুলে সে লোরের মুখের দিকে তাকাল। চার চোখের মিলন মাধুরীতে চারিদিক যেন নতুন প্রাণের আলোয় সঞ্জীবিত হয়ে উঠল।

✤ চন্দ্রাণীর মিলন ✤

চন্দ্রাণীর পুনর্জীবনলাভে সারথি মিত্রকণ্ঠও অত্যন্ত উল্লসিত। ঋষির করুণায় সকলেরই মনোবাসনা পূর্ণ হল। এইভাবে চন্দ্রাণীকে ঘিরে যখন লোর ও মিত্রকণ্ঠ আনন্দে উচ্ছ্বসিত, ঠিক সেই সময়ে ঋষি অন্তর্হিত হলেন। আনন্দিত লোর যখন চন্দ্রাণীকে সঙ্গে নিয়ে পুনঃপ্রণিপাতের জন্যে উদ্যোগী হলেন, তখন আর ঋষিকে দেখতে পেলেন না। ঋষিকে যুগল প্রণাম জানাতে না পেরে লোরের মনে অনুশোচনা এল। তিনি বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে ঋষিকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।

চন্দ্রাণী লোরের এই বিস্ময়বিমূঢ় অনুসন্ধানী দৃষ্টির অর্থ বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল যে সে সামনে থাকা সত্ত্বেও লোর কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে? লোর তখন সবিস্তারে সেই ঋষির বিবরণ এবং চন্দ্রাণীর জীবন ফিরে পাওয়ার ঘটনা সবিস্তারে চন্দ্রাণীর কাছে বর্ণনা করলেন এবং ঋষিকে দেখতে না পাওয়ার দরুণ তাঁর মনের যে অনুশোচনা, তা যে সারাজীবনের মতো ক্ষোভের আকারে অন্তরের অন্তঃস্থলে সুপ্ত থাকবে, তাও তিনি চন্দ্রাণীকে জানিয়ে দিলেন।

এরপর লোর ও চন্দ্রাণী দুজনে বিশ্রামের জন্যে নির্জন কাননের উদ্দেশ্যে গেল।

এদিকে গোহারীরাজ মোহরা বামনের সারথির কাছে সমস্ত কিছু অবগত হলেন। নিজ মতামত পোষণের আগেই সারথি রাজাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল প্রতিদানস্বরূপ পুনরায় যুদ্ধের আয়োজন না করতে। কেননা মৃত বামনও মৃত্যুর আগে সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানিয়ে গেছে লোর-চন্দ্রাণী জুটিকে, আর তাছাড়া বীর লোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার আয়োজনও নিতান্ত বাতুলতা মাত্র। সর্বোপরি দুজনে মিলিত হয়ে যেখানে দুজনেই সুখী সেখানে আর কেনই বা যুদ্ধের আয়োজন?

এই সমস্ত শুনে রাজা সৈন্যসামন্ত সমভিব্যবহারে লোর ও চন্দ্রাণীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। রাজা সসৈন্যে বনে প্রবেশ করতেই দুন্দুভির শব্দ আর অশ্বখুরের ধুলো দেখে লোররাজ ভাবলেন চন্দ্রাণীর পিতা মোহরারাজই হয়তো জামাতা নিধনের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে লোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। কিন্তু তিনি তো একেবারে একা। তিনি কীভাবে এই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে একা সামাল দিবেন? সেই চিন্তাতেই লোররাজ যখন বিধ্বস্ত, ঠিক তখনি মোহরারাজ লোর ও চন্দ্রাণীকে রাজধানীতে ফিরে গিয়ে রাজ্যের ভার গ্রহণ করবার অনুরোধ জানালেন। রাজমহিষীও চন্দ্রাণীকে বারংবার আদেশ ও অনুরোধের মাধ্যমে লোরসহ রাজ্যে ফিরে গিয়ে পিতৃ-মাতৃ উপদেশ রক্ষা করার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করলেন। অবশেষে পিতা-মাতার অনুনয় উপেক্ষা করতে না পেরে চন্দ্রাণী তার একমাত্র অবলম্বন পতি লোররাজের কাছে প্রার্থনা জানাল তাঁর পিতৃরাজ্যে ফিরে গিয়ে রাজ্যপরিচালনা করার।

অতঃপর চন্দ্রাণীর একান্ত অনুরোধে লোররাজ চন্দ্রাণী ও সৈন্যসমভিব্যাহারে মোহরা রাজের সামনে উপস্থিত হয়ে উভয়ে একসঙ্গে রাজা ও রাজমহিষীকে প্রণাম জানাল। তাঁরাও অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে চিন্তামুক্ত মনে কন্যা ও জামাতাকে গ্রহণ করলেন। মোহরারাজ লোরকে

অশীর্বাদ করে রাজ্যপাট সৈন্যসামন্ত সমস্ত কিছু লোরকে সমর্পণ করলেন এবং উপযুক্ত মন নিয়ে রাজ্যভার পরিচালনার অনুরোধ জানালেন।

বৃদ্ধ শ্বশুরের কথামতো লোররাজ চন্দ্রাণীকে সঙ্গে নিয়ে মোহরা নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

রাজমহিষী অত্যন্ত আনন্দিত মনে রাজ্যের ঘরে ঘরে আনন্দ কৌতুক করার নির্দেশ দিলেন। লোরকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে বৃদ্ধ মোহরাজরাজ নিজে রাজগুরুর বেশে রইলেন।

বামনকে পরাজিত করে লোররাজ রাজা ভার্যা, হারিয়ে যাওয়া সৈন্য সামন্ত সমস্ত কিছুই পেলেন ও মনের আনন্দে পৃথিবী প্রতিপালন করতে লাগলেন।

এইভাবে চন্দ্রাণীর সঙ্গে চন্দ্রাণীর দেশে রাজা লোর যখন আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন, তখন স্বভাবতঃই আমাদের জানতে ইচ্ছে করে সেই সময় গোহারী দেশ থেকে অনেক দূরে লোরের প্রথমা পত্নী ময়নামতীর দিন কীভাবে কাটছিল। এক্ষেত্রে কথা জানার একমাত্র পথ কবির রচনা ও বর্ণনা। তাই পুনরায় দ্বারস্থ হতেই হয় দৌলত কাজীর। দেখা যাক এ ব্যাপারে কবির অভিমত কি বা তিনি কি লিখেছেন তাঁর কাব্যে।

✤ সতীময়না ✤

বিরহিণী ময়নার কাছে রত্নামালিনীর আগমন ঃ রাজা লোর যখন গোহারী দেশে দ্বিতীয়া পত্নী চন্দ্রাণীকে নিয়ে আনন্দে দিন কাটাচ্ছেন, তখন এদিকে লোরের নিজের রাজ্যে তাঁর হতভাগিনী পত্নী ময়না নিত্য দেবসেবায় আর স্বামী আরাধনায় দিন অতিবাহিত করছেন। ওদিকে চন্দ্রাণী যখন রাজঅন্তঃপুরে রম্য সরোবরের তীরে কুসুম কাননে বিলাসিনী, এদিকে তখন নির্জন কাননে স্বামীর কল্যাণ কামনায় হরগৌরী পূজায় রত এক নিষ্পাপ বিরহিণী—তার নাম ময়না।

সে নিঃস্বার্থভাবে হরগৌরীর পদে প্রার্থনা করে রাজ্যের মঙ্গল, স্বজনের মঙ্গল আর তার স্বামীর মঙ্গল। দুঃখিত জনকে ধন দান করে, অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করে এবং সত্যের প্রতিষ্ঠা করেই ময়নার দিন কেটে যায়।

সেদেশে ছাতন নামে এক রাজকুমার ছিল। কপট লক্ষণে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। প্রচুর ধনরত্নের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তার কুটিল মনে সৎচিন্তা বা সৎকর্মের প্রবৃত্তি এল না। যুবতী ময়নার রূপে মুগ্ধ হয়ে তার ময়নার সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রবৃত্তি জাগল। কিন্তু পতিব্রতা ময়নার সঙ্গে অক্লেশে মিলিত হওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয় বুঝে সে তার কপটতা চরিতার্থ করার জন্যে রত্না মালিনীকে নিয়ে এল।

রত্না মালিনীর নামটি সুন্দর হলেও সে প্রবঞ্চকের শিরোমণি। তার মুখে মধুর বচন কিন্তু অন্তর বিষে পরিপূর্ণ। যে কোনও কুটকর্মই তার দ্বারা সম্পন্ন হয় সুনিপুণ ভাবে। এহেন মালিনীকে প্রচুর ধনরত্ন প্রদান করার অঙ্গীকার করে ছাতন ছলে বলে কৌশলে যে কোন ভাবে ময়নামতীর সঙ্গে তার মিলন ঘটিয়ে দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করল। মালিনী সানন্দে সম্মতি জানিয়ে তার কাজ শুরু করল।

সুন্দর অঙ্গসজ্জা করে, মন্দিরে প্রবেশ করে চন্দন, ফুল, সুগন্ধি ও ফুলের মালা উপহার দিয়ে ময়নাকে প্রণাম করল। ময়নাও হাসিমুখে তার আগমন সংবাদ জিজ্ঞাসা করল। রত্না তখন অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে তার উত্তরে জানাল যে, আজ দুর্ভাগ্যবশত তার এই হতদরিদ্র অবস্থা, কিন্তু একদিন তো ময়নার শিশুকালে সে তারই ধাইমা ছিল। সে কথা কি ময়না আজ ভুলে গেছে? কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনও দুষ্ট গ্রহের ফেরে ময়না একটু বড় হতেই সে সমস্ত সম্পদ ত্যাগ করে অন্য জায়গায় চলে গেল এবং নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনল।

সে আরও জানাল যে, সে চলে গেছিল ঠিকই কিন্তু তার মন পড়েছিল ছোট্ট ময়নার দিকেই। আজ অনেকদিন পর তার চাঁদমুখ দেখে তার মনের জ্বালা যন্ত্রণা সব দূর হল এবং মনের সব সন্দেহও মিটে গেল।

এইবার মালিনী ময়নাকে নানা ধরণের উপহার প্রদান করল এবং ময়নার আদেশে মন্দিরে উঠে বসল।

এরপর ময়নাও মালিনীর কথামতো অঙ্গে গন্ধ কুসুমাদির প্রলেপ দিয়ে সখীসমভিব্যাহারে স্নান করল।

মালিনী মনে মনে পরিকল্পনা করল ময়নাকে নিয়ে অন্য কোথাও যাওয়ার এবং সেই সুরম্য জায়গায় নানা ধরনের রসপূর্ণ কথাবার্তা এবং ছলকলার মধ্যে দিয়ে ময়নার অন্তরে কামনার উদ্রেক করার। এমতাবস্থায় সে ময়নাকে স্বামীর কথা বলল এবং কীভাবে এই পরিপূর্ণ যৌবনে সে স্বামী সাহচর্য বিহীন হয়ে রাত কাটাচ্ছে কথা প্রসঙ্গে তাও জিজ্ঞেস করল। এইভাবে নানা কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে মালিনী ময়নার আরও নিবিড় সাহচর্যে এল।

❖ মালিনীর দৌত্য ❖

ছলনার মায়াজাল জড়িয়ে কপট মালিনী নানারকম মুখরোচক আদিরসাত্মক গল্প রচনা করে ময়নাকে শোনাতে লাগল তাকে পাপের পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। গল্পগুলি যেন অমৃতের মোড়কে গরলের পরিবেশন।

নানান বিকৃত রুচির গল্পের অবতারণার পর কপটিনী রত্না ময়নাকে বলল যে সে যেহেতু তার ধাইমা, সেহেতু সে তার মঙ্গলই চাইবে। তাই এই ভরা যৌবনে স্বামীসঙ্গ সুখে বঞ্চিত ময়নাকে দেখে তার যেন বুক ফেটে যাচ্ছে। কেননা নারীর যৌবনকাল জোয়ারের জলের মতোই ক্ষণস্থায়ী, তাই যেন তেন প্রকারেণ ভাঁটা এসে পড়ার আগেই তাকে পরিপূর্ণ ভাবে ভোগ করে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। ময়নাও যেন তার অন্যথা না করে। এ ব্যাপারে সে নিজে ময়নাকে সাহায্য করবে যৌবনকে উপভোগের উপযোগী পুরুষের সাহচর্য এনে দিয়ে।

রত্নার কথাবার্তা শুনে ময়নার মনে হল—ধাই হয়ে সে তাকে এমন পাপ উপদেশ দিচ্ছে কেন ? মনে সন্দেহ নিয়ে ময়না ধাইকে খুব ভালভাবে নিরীক্ষণ করল—ব্যাধ যেমন বনে প্রবেশ করে অত্যন্ত সন্তর্পণে শর সন্ধান করে, অনেকটা ঠিক সেইরকম। রত্নার সবকথা ময়না মনের মধ্যে এক উল্টো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল।

ময়নার মনে হল ক্ষণিকের সুখের জন্যে কোনও নারীরই তার জাতি কুল ধর্ম নাশ করে এমন জন্মজন্মান্তরের পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। এই মনে করে ময়না অনুতাপ করতে লাগল।

ময়নার এ হেন উক্তি শুনে রত্না অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে বলল যে ময়নার হিতাহিতজ্ঞান, বুদ্ধিশুদ্ধি সমস্ত কিছুই লোপ পেয়েছে। যে সময়ে প্রতিটি নারী রতিরঙ্গরসে বিলাসে সময় অতিবাহিত করে, ঠিক সেই রকম সময়েই ময়নার এহেন বিরহিণী দশা। তার মলিন বেশ, রুক্ষ কেশ, নয়নে অঞ্জন নেই, সিঁথিতে সিঁদুর নেই, খোঁপার বাঁধন আলগা হয়ে গেছে, চন্দনহীন ধূসর গা, তাম্বুলহীন নীরস অধর। কোন্ দুঃখে ময়নাবতী এত সুখভোগ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে। রত্নার এই উক্তি শুনে ময়না তার ধর্মকে অনুসরণ করে বলল যে, যে দুঃখে আজ সে দুখী তা যেন তার সতীনের হয়। সে আজ কাকে দেখে বিলাস-ব্যাসন করবে, তার সিঁথির সিঁদুরই তো হরণ করে নিয়েছে ওই গোহারী রাজকন্যা চন্দ্রাণী। যার জন্যে আজ তার রসিক স্বামী তাকে এড়িয়ে চলছে। এক এক করে ত্যাগের শেষ সীমায় এসে তাকে যদি প্রাণত্যাগও করতে হয়, তবু সে এক ছাড়া দ্বিতীয় কোনও জনের কথা মনেও আনবে না বা কারো গুণে কথা স্মরণও করবে না। তাঁর স্বামী জগৎ পূজিত হয়েও তাকে যে বিরহের সাগরে মজ্জমান করে গেল, তার কোনও তুলনা নেই। তবু ময়না এ সমস্ত কিছুকেই তার মন্দ ভাগ্যের পরিহাস বলেই মনে করেছে। কেননা বিধির বিধান যেমন কেউ খন্ডন করতে পারে না তেমনি বিধি যদি বাম বা বক্র হয়, তাহলেও কারো কিছু করার থাকে না।

সতীময়নার, এই ধরনের তীক্ষ্ণ বজ্রসম উক্তি শুনে মালিনীর মনে পড়ে গেল ছাতনের কাছে তার প্রতিশ্রুতি দানের কথা। তাই সে মনে পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে আবার নতুন

উদ্যমে ময়নার সত্য ও সতীত্ব ভঙ্গের উপায় উদ্ভাবন করতে লাগল। কেননা মালিনী বুঝতে পেরেছে যে ধনদৌলত বচন কোনও কিছুতেই ময়নার মনে পরিবর্তন আনা যাবে না।

তথাপি মালিনী হাল না ছেড়ে পুনরায় ময়নার কাছে বলতে শুরু করল নারীর আকাঙ্ক্ষিত যৌবনকালের রসতত্ত্ব। তাঁর বক্তব্যের সারবস্তু হল—সংসারে ধন যদি নষ্ট হয়, তাহলে তা পুনরায় উপার্জন করা যায়। অগ্নিও যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে পাথরে পাথরে ঘর্ষণ করলেই তার পুনঃপ্রাপ্তি সম্ভব। চন্দ্র সূর্য অস্ত গেলেও পরদিন প্রাতে পুনরায় উদিত হয়। শুধুমাত্র যৌবনকাল যদি একবার চলে যায় তাহলে আর কোনদিন ফিরে আসে না। একথা সকলেরই জানা যে মূর্খ লোকেরাই যৌবনকে হেলায় অতিবাহিত করে। সমবয়সী ও সমচিত্তধর্মী সকলেই যখন রঙ্গকেলিতে রত তখন ময়না কেনই বা অপরাধিনীর মতো শোকে এমন করে সময় নষ্ট করছে? লোর যখন তাকে তার ভার্যা বলে মনেই করে না তখন সেই লোরের জন্যে এত দুঃখ সয়ে নিজের যৌবনকে কেন ময়না এত নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত করছে?

✤ বারমাসী মালিনী ✤

এখান থেকে আমরা মালিনীর সঙ্গে ময়নার উত্তর প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে পাই ময়নার বারমাসের দুঃখ বর্ণনা। আষাঢ় মাস থেকে শুরু হয়েছে বারমাসী বর্ণনা। প্রথম বর্ণনাটি মালিনীর মুখে।

কপট অভিনয়ের সঙ্গে মালিনী বলতে শুরু করল যে রাজনন্দিনী হয়েও ময়নার এত দুঃখ তার প্রাণে আর সইছে না। 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' যখন বর্ষা দুয়ারে অপেক্ষমান, ময়ূর পেখম ধরে নৃত্যরত, ঘরে ঘরে দম্পতিরা উৎফুল্ল চিত্তে যখন প্রেম তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত, তখন ময়নার এহেন বিরহিণী দশা দেখে দুঃখে মালিনী মাটিতে আছড়ে পড়ে বিলাপ করতে লাগল।

ময়নাকে পুনর্বারের প্রচেষ্টায় মালিনী আবার বলতে শুরু করল সেই একই কথা এই নিদারুণ বর্ষায় ময়না যেন একা একা রাত না কাটিয়ে মালিনীর পরামর্শমতো এক সুজন নাগরের সঙ্গে এই পরিপূর্ণ যৌবন উপভোগ করে জীবন সার্থক করে। কেননা নারী বৃদ্ধ হয়ে গেলে যুবক আর তার দিকে ফিরেও তাকায় না। তই সময় থাকতেই সচেতন ভাবে সবকিছু বুঝে নেওয়া উচিত।

সবশেষে কবি দৌলত আমাদের জানালেন যে এতভাবে ময়নাকে বোঝানো সত্ত্বেও সতী ময়না ভুলেও সৎপথ পরিত্যাগ করে অন্য পথের পথিক হলেন না।

✤ ময়না ✤

ময়না মালিনীকে একান্ত অনুরোধ জানায়, মালিনী যেন এই ধরনের অনুচিত কথাবার্তায় আর তাকে কোনভাবেই প্ররোচিত না করে কেননা এতে কোনও লাভ নেই। কেননা এই রকম নারকীয় পাপকর্মে সে কোনভাবেই লিপ্ত হতে পারবে না। তার পথ যেমন আছে তেমনি সত্যেরই থাকবে, তাতে যত দুঃখই থাক।

ময়না আরও বলে যে, সে মনের মধ্যে যে মধুর মূর্তি স্থাপন করেছে এবং যার ধ্যানে সে প্রতিমুহূর্তে নিমগ্ন, সেই ধ্যানকল্পনা ছেড়ে আর কাউকে সে গ্রহণ করতে পারবে না মালিনী তার হিত চিন্তা করে ধাই হিসেবে যা কিছু উপদেশ তাকে দান করেছে তা সবই নিছকই পাপকর্ম, নিছকই পাপবাসনা। মালিনী তার হিতচিন্তা করে যা কিছুই বলছে, তা সবই তার জাতি-কুল-ধর্ম নাশের অনিবার্য কারণ। অতএব মালিনীর নির্দেশিত পথ সর্বান্তঃকরণে পরিত্যাজ্য।

✤ মালিনী ✤

আষাঢ় গেল, এল শ্রাবণ। মালিনীর সেই একই কথা, একই অসাধ্য সাধনের প্রচেষ্টা। যদিও তার মত ও পথ বারে বারেই আঘাত পেয়ে ফিরে এসেছে ময়নার মনের দুয়ার থেকে তথাপি চেষ্টার বিরাম নেই।

শ্রাবণের রিমঝিম বারিধারা বিরহকে জাগিয়ে তোলে। মিলনের আনন্দকে পরিপূর্ণ করে দেয়। শ্রাবণের সংস্পর্শে প্রকৃতিতে যখন সবুজের সমারোহ, সবুজের নেশা, তখন ময়নার এহেন অবুঝ মনোভাব কেন? যে তাকে ভুলে আছে তার চিন্তায় মগ্ন না থেকে, এমন সময় নষ্ট না করে ময়নার উচিত নতুন কান্তের সাথে যৌবনের পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করা।

উত্তরে ময়নার অভিমত—এতে কোনও ভুল নেই যে তার বেদনার শেষ নেই এবং বর্ষার নিদারুণ সংস্পর্শে একেবারে যথার্থ অর্থেই তার 'ফাটি যাওত ছাতিয়া' তথাপি মালিনী যেন লোর ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের কথা তার সামনে আর মুখে না আনে। কেননা সতী নারীর ধ্যানে জ্ঞানে-মননে-কামনায়-বাসনায়-স্বামীই একমাত্র চিন্তনীয় পুরুষ, আর কেউ নয়। ময়নাও এর ব্যতিক্রম নয়। তার কাছে পরপুরুষের সঙ্গ কালনাগিণীর ছোবলের মতোই বিষপূর্ণ। ভ্রমরের সঙ্গে যেমন গোময়-কীটের কোনও তুলনাই হয় না, লোরের সঙ্গেও তেমনি পৃথিবীতে লক্ষাধিক পুরুষের তুলনা অবাঞ্ছিত, অপ্রাসঙ্গিক।

আষাঢ় গেল, শ্রাবণ গেল, গুটিগুটি পায়ে এল 'মাহ ভাদর'। প্রচণ্ড মেঘের গর্জনে পাতালে নাগগণ ও কম্পমান। যৌবন চলে গেলে আর কিছুই করার থাকবে না। তাই প্রকৃতিতে মিলনের এমন পরিপূর্ণ আয়োজনকে অস্বীকার না করে ময়না যেন তার দেহের পসরা উপযুক্ত কারো হাতে সমর্পণ করে জীবনের আনন্দ পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করে।

প্রত্যুত্তরে ময়না জানায় যে, সে সত্যিই হয়তো খুব বড় অপরাধী। নইলে এমন বিরহতাপদগ্ধ অবস্থা তার হল কেমন করে এমন যৌবনকালকে অগ্রাহ্য করে তার পতি বিদেশে কাল কাটাচ্ছেই বা কেন লোরের বিরহে তার দেহ মন প্রাণ সবকিছুই যেন অবশ হয়ে আসছে।

"আজি শরত তপনে প্রভাতস্বপনে
কী জানি পরাণ কী যে চায়"

—এই যে অনির্দেশ্য চাওয়ার বেদনা—এ কবিগুরুর থাকলেও আমাদের নায়িকা ময়নার তা নেই। কেননা ময়না জানে সে কি চায়, তার শুধু না পাওয়ার বেদনা।

এই যে মিলনের ঋতু শরৎ, যখন প্রবাসী প্রিয়ও ঘরে ফিরে আসে নিবিড় আকুলতায়, দুদিনের জন্যে হলেও প্রিয়াসান্নিধ্যে ভুলতে চায় জীবনের কর্মগ্লানি, ময়না তখনও একলা, লোরের বিহনে সে জর্জরিতা।

সুযোগকে মুষ্টিবদ্ধ করে পায় মালিনী। সে ময়নার সঙ্গী হিসাবে ছাতন কুমারের নাম প্রস্তাব করে। এবং ময়নার সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও ও দেয়। ময়না বুঝতে পারে দূতীর সব ছলচাতুরি প্রত্যাখ্যাত হয়, তথাপি মিলনের পরিপূর্ণ পসরা নিয়ে

উপস্থিত শরৎ ঋতুতেই ময়নার এমন দুর্দশা কেন। এই তার কপট জিজ্ঞাসা। শুধু জিজ্ঞাসাই নয়। ময়নার সতীত্ব রক্ষার প্রচেষ্টাই যেন তার মনোবেদনার কারণ।

হেমন্তের প্রথম মাস কার্তিকে মালিনীর ময়নার প্রতি সহনশীলতা অসহনীয় হয়ে উঠল। আর সেইজন্যেই সে ময়নাকে তিরস্কার করে বলল যে, স্বামীকে নিয়ে ময়নার বৃথা গর্ব করা। কেননা যাঁকে নিয়ে ময়নার অহংকার, তিনি মোটেই তার যোগ্য নন। যে স্বামী পরনারীর অধীনস্থ হয়ে নিজের বিবাহিত স্ত্রীর কথা ভুলে যায়, তাকে পরিত্যাগ করে পরনারীতেই আসক্ত হয়। সে তো পুরুষ, তাকে নিয়ে গর্ব করার কিছু থাকতে পারে কি ? পুরুষের স্বভাবই এই—ফুলে ফুলে মধুর সন্ধান করে বেড়ায় কিন্তু নারী তার স্বভাবধর্ম বলে একই জায়গায় অধিষ্ঠিত।

ময়নার কাছে ক্ষমা চেয়ে সে আরও বলেছে যে, ময়না যেন ক্রোধ পরিত্যাগ করে, তার কথাগুলি একটু বোঝবার চেষ্টা করে। কামার্ত পুরুষের কাছে আগে দেহসুখভোগ তারপর অন্য কিছু। পাপ-পুণ্যের কোন বালাই তার থাকে না।

ময়নাকে যে যতই মৃত্তিকার কায়া বলে অভিহিত করুক না কেন, সেটাই কিন্তু সর্ব দোষস্খলনের উপায় মাত্র নয়। কেননা মাটিকে কেন্দ্র করেই এই বিশ্বসংসারে পঞ্চভূতের লীলাখেলা। কাজেই সেই মাটিরও একটি বিশেষত্ব ও গুরুত্ব আছে। এই বলে মালিনী ময়নাকে দিলেন মাটিতত্ত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত উপদেশ।

কিন্তু কোনও উপদেশই কাজ করে না ময়নার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়। কার্তিক মাসে দেওয়ালির উৎসবে যখন চারিদিকে মাতোয়ারা। তখন ময়নার নিশিভোর হচ্ছে প্রিয়বিচ্ছেদের মর্মান্তিক যন্ত্রণায়। সে যে সেকথা জানেনা তা নয়। তবু কিছু করার নেই শুধু প্রতীক্ষার পর প্রতীক্ষা করা ছাড়া।

কার্তিক গেল, এল অগ্রহায়ণ। সমগতিতে সমান্তরাল ভাবেই বেড়ে চলেছে ময়নার বিরহজ্বালা আর মালিনীর প্ররোচনার উপদেশ মালা। অগ্রহায়ণের সোনালী প্রকৃতি, নতুন ধানের গন্ধ, সুগন্ধি শালিধানের অন্নভোগে নবান্ন উৎসব, সুখী গৃহস্থালির চিত্র আর তারই পাশাপাশি সুখী দাম্পত্য জীবনের চিত্র, হেমন্তের হিম ঝরা রাতে সুখের শয্যা—এসব কিছুই বারে বারে আঘাত করে যায়, যন্ত্রণা দিয়ে ছুঁয়ে যায় ময়নার একাকীত্বকে। তাই মালিনীর উপদেশ—ময়নার কাছেও তো কোনকিছুই দুর্লভ নয়। সে তো ইচ্ছে করলেই সুখের পরশ পেতে পারে। তাতে তার সতীধর্মের কোথাও কিছু ঘাটতি হবে না। কেননা শাস্ত্রেই উপদেশ দেওয়া আছে যে, কামক্রীড়া কোনও পাপ কাজ নয়, এতো মনের অবদমিত ইচ্ছের পরিস্ফুটন, তাই এতে কোনও পাপ নেই যা ময়নার সতীত্বহানিকর হতে পারে। কারণ, কামরস ধর্মশাস্ত্র বহির্ভূত নয়। ধর্মশাস্ত্রে রাধা, বিদ্যা কুন্তী ইত্যাদি অনেক কামাহতা নারীর পরিচয় আমরা পাই। ময়নাও নিশ্চয়ই তাদের ব্যতিক্রম নয়। কারণ মদনের লাঞ্ছনা সহ্য করার শক্তি বড়ই দুষ্কর। ময়নাও যেন সময় থাকতে এই লাঞ্ছনার সুযোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়ে তার জীবন-যৌবন সার্থক করে।

ময়না তথাপি তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় অনড় অটল।

হেমন্তের অবসানে এল শীতের পরশ। শীতের কম্পিত রাতে শয্যায় পতির সাহচর্যের উষ্ণতা যে রমণীর ভাগ্যে জোটে না—বড় বিড়ম্বিত তার জীবন। তথাপি এই বিড়ম্বিত জীবনের

জ্বালা ময়না মুহূর্তে ভুলতে পারে যদি মালিনীর উপদেশ সে শোনে। মালিনী তার সমস্তবিরহ যন্ত্রণা নিমেষে ভুলিয়ে দিতে পারে ময়নার মতো চন্দ্রসমার সঙ্গে উপযুক্ত পুরুষচকোরের মিলন ঘটিয়ে।

পতিব্রতা ময়নার মন টলে না কোনও প্রলোভনেই। তার অন্তরে বাইরে কেবলই লোর। নয়নের জল দিয়ে সে লোরের পা ধুয়ে দিতে চায়। তার প্রিয়মুখ দর্শন না করা পর্যন্ত যেন ময়নার মনে শান্তি নেই। পতিব্রতা সতী হিসেবেই তার নাম জগতে জ্বলজ্বল করবে, তার মৃত্যুর পরে বৈকুণ্ঠের দরজাও যেন তার জন্যে উন্মুক্ত থাকবে বলেই তার বিশ্বাস। মালিনীকে তিরস্কার করে ময়না বলে যে সে তার ধাইমা হলেও মোটেই তার হিত চায় না! সে কেবলিই তাকে বিপথে চালাবার চেষ্টা করে। ধাই হলেও এমন নারীর মুখ দর্শনও তার কাছে পাপকাজ বলেই চিহ্নিত।

শীতের জড়তা থেকে মুক্তি পেয়ে বহিঃপ্রকৃতিতে যখন মুক্তির রঙিন আনন্দ, ঋতুরঙ্গশালায় তখন বসন্তের সলজ্জ আগমন ফাল্গুনের হাত ধরে 'নম্র নেত্রপাতে'। বসন্ত প্রেমের ঋতু, বসন্ত রাঙিয়ে দিয়ে যাওয়ার ঋতু। ফাগুনের ফাগুয়ার রঙ শুধু বনেই লাগে না, লাগে মনেও—সে লেগেছে ময়নারও। শুধু সেই রঙে দেহ রাঙিয়ে দেবার কেউ নেই। যা আছে, তা শুধু মালিনীর প্রলোভন। তাতে অন্তরের অন্তর্দহন তো মেটেই না বরং ক্ষোভের কারণে আরও বিচলিত হয়ে পড়ে মন। ময়না বুঝতে পারে, কিছু করতে পারে না—শুধু আপ্রাণ চেষ্টা করে শত প্রলোভনের মধ্যেও 'সতীময়না'-কে উজ্জ্বল রাখতে। আর তাই নিষ্পাপ প্রেম 'অশ্রু জলের করুণরাগে' বারে বারে অনেক দূরে থাকা লোরের পায়ে আছড়ে পড়ে শুধু একটি কথাই বলতে চায়—

"রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও যাও গো এবার।"—আর কিছু নয়।

মধুমাসের 'পূর্ণচাঁদের মায়া' কোনও ঢেউ তোলে না ময়নার মনে। কালের নিয়মে একজন যায়, আসে আরেকজন। কোকিলের কুহুতান প্রাকৃতিক নিয়ম মেনেই বরণ করে নেয় মাধবীমাসকে। দূতী আবার বলে যেমন করে ঋতুচক্র পুনরাবর্তিত হচ্ছে, ঠিক তেমনি বয়সের ধর্ম মেনে যৌবনও একদিন চলে যায়, আর ফিরে আসে না। কান্ডারীহীন নৌকা যেমন তার দিক হারিয়ে ফেলে, পুরুষ বিহীন নারীর জীবনেও তেমনি এই দিগভ্রম ঘটে, সংশয় আসে। যদিও ময়না বুদ্ধিমতী তথাপি মালিনী তাকে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চায় যে, বসন্ত চলে যাওয়া সত্ত্বেও লোর যখন ময়নার কাছে এল না, তখন সে অন্য নারীতেই আসক্ত, হয়তো ময়নার খবর নিতে আর কোনদিনই আসবে না। যার হৃদয়ে প্রেম নেই সে নরাকৃতি পাষন্ড। যে ময়নার চিন্তামাত্রও করে নাম ময়নারও তার চিন্তা করা অহেতুক। বরং যে ময়নাকে লাভ করতে চায় তাকেই শত্রুতুল্য মনে না করে সুহৃদ ভাবা উচিত।

মালিনীর মুখের কথা, যথাস্থানেই রইল। শুধু ইহলোকে সম্ভব না হলে পরলোকে পতি সঙ্গলাভের বাসনা নিয়ে ময়নার মাধবী মাসও কেটে গেল।

অন্তরে বাইরে জৈষ্ঠের দাবদাহে জর্জরিতা ময়নার কথা লিখতে লিখতে দৌলত কাজী হঠাৎই কাব্যটি শেষ করে ফেলেছেন—হয়তো মৃত্যুজনিত কারণেই।